وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কোনো অমুসলিম দেশে যাবে অতঃপর তাদের উৎসব-সংস্কৃতি পালন করা শুরু করবে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য রেখে চলবে, সে যদি ঐ অবস্থায় মারা যায়; তবে কিয়ামতের দিনে তাকে তাদের সাথে উঠানো হবে (বায়হাক্বী, সুনান কুবরা, হা/১৮৮৯৫)।

● ৮ম বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● মে ২০২৪

Web : www.al-itisam.com

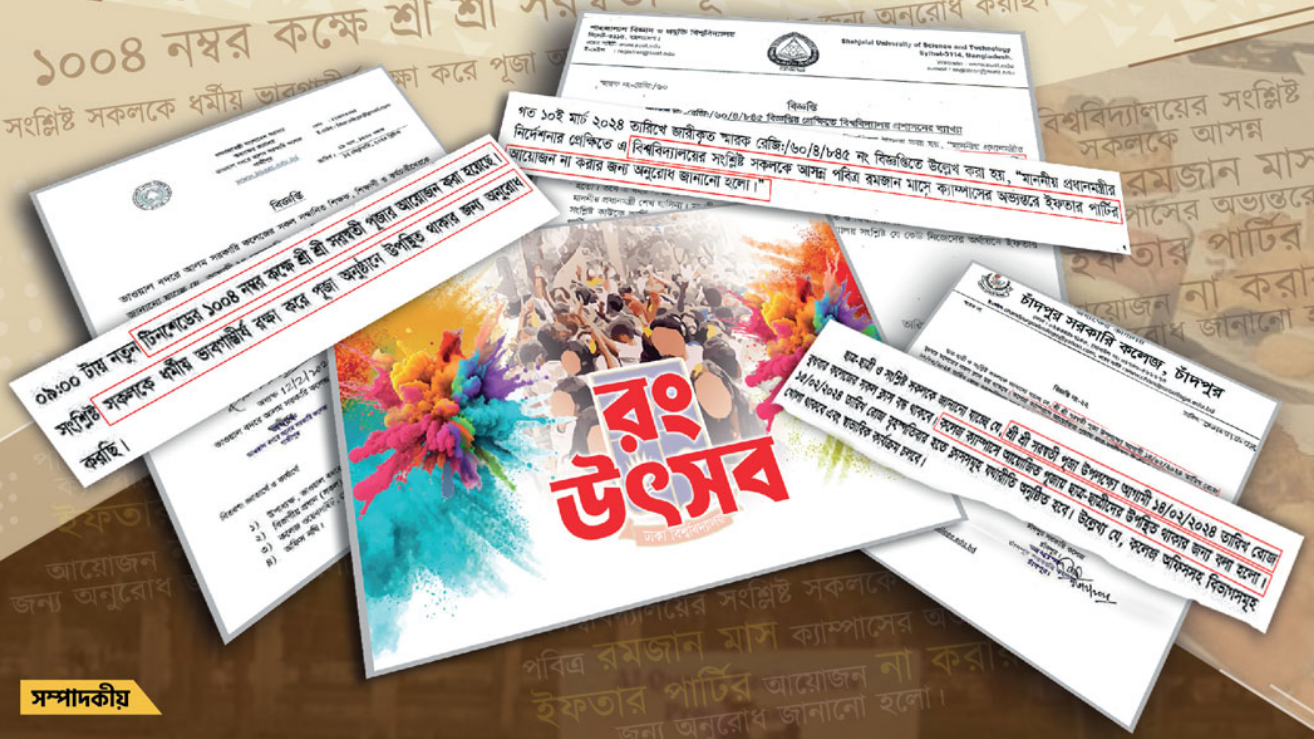

সম্পাদকীয়

ইসলাম ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় উদাসীনতা আর অন্য ধর্ম ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় সহযোগিতা- এ কেমন দেশপ্রেম-ধার্মিকতা!

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٨، شوال و ذو القعدة ١٤٤٥هـ/ مايو ٢٠٢٤م العدد: ٧، الجزء: ٩١
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৫ || ঈসায়ী ২০২৪ || বঙ্গীয় ১৪৩১

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ - মে	২১ - শাওয়াল	বুধবার	০৪.০৩	০৫.২৩	১১.৫৫	০৩.২১	০৬.২৭	০৭.৪৮
০৫ - মে	২৫ - শাওয়াল	রবিবার	০৪.০০	০৫.২১	১১.৫৫	০৩.২০	০৬.২৯	০৭.৫০
১০ - মে	০১ - যুলক্বা'দাহ	শুক্রবার	০৩.৫৬	০৫.১৮	১১.৫৫	০৩.১৯	০৬.৩২	০৭.৫৪
১৫ - মে	০৬ - যুলক্বা'দাহ	বুধবার	০৩.৫২	০৫.১৫	১১.৫৫	০৩.১৮	০৬.৩৪	০৭.৫৭
২০ - মে	১১ - যুলক্বা'দাহ	সোমবার	০৩.৪৯	০৫.১৩	১১.৫৫	০৩.১৭	০৬.৩৭	০৮.০১
২৫ - মে	১৬ - যুলক্বা'দাহ	শুক্রবার	০৩.৪৭	০৫.১২	১১.৫৫	০৩.১৭	০৬.৩৯	০৮.০৪
৩০ - মে	২১ - যুলক্বা'দাহ	বৃহস্পতিবার	০৩.৪৫	০৫.১১	১১.৫৬	০৩.১৬	০৬.৪১	০৮.০৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৪
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+৪	+২
মাদারীপুর	+২	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+২
শেরপুর	-১	০	+৪
জামালপুর	-১	০	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-২	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৩	-৩	-৭
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৫	-৫	-৬
রাঙ্গামাটি	-৫	-৫	-৭
বান্দরবান	-৪	-৫	-৯
কুমিল্লা	-২	-৩	-৩
নোয়াখালী	-১	-১	-৩
লক্ষীপুর	০	০	-১
চাঁদপুর	০	০	-১
ফেনী	-২	-৩	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-২

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+১১
নাটোর	+৪	+৫	+৮
পাবনা	+৪	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৪	+৫	+৮
জয়পুরহাট	+৩	+৪	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৮
দিনাজপুর	+৩	+৪	+১১
গাইবান্ধা	০	+১	+৭
কুড়িগ্রাম	-১	০	+৭
লালমনিরহাট	-১	+১	+৮
নীলফামারী	+১	+৩	+১০
পঞ্চগড়	+২	+৩	+১২
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৪	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৫	+১২
বাগেরহাট	+৫	+৪	+১১
সাতক্ষীরা	+৮	+৭	+৫
যশোর	+৬	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৭
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৮
মাগুরা	+৫	+৫	+৪
নড়াইল	+৫	+৫	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+২	-১
পটুয়াখালী	+৩	+৩	-১
পিরোজপুর	+৪	+৪	০
ঝালকাঠি	+৩	+৩	০
ভোলা	+১	+১	-২
বরগুনা	+৫	+৪	-১

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৮ম বর্ষ
৭ম সংখ্যা
মে ২০২৪
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪৫

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ তরিকুল ইসলাম ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম ভাষণে ছাহাবীগণের আবেগপ্রবণতা! আর আমরা? ০৪
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» কার সাথে পর্দা করবেন? (শেষ পর্ব) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» আল্লাহর ভালোবাসা ১১
-মুস্তফা মনজুর
» ইক্বামাতুছ ছালাত ও আমাদের শিক্ষা ১৪
-রফিকুল আলম আজাদ
» নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৭
-মাযহারুল ইসলাম
» নারীমুক্তি আন্দোলন এবং কিছু বাস্তবতা ১৯
-মো. হাসিম আলী
» ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষের আফসোসের কারণ ২১
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী
» নব্য জাহেলিয়্যাত ২৩
-সাঈদুর রহমান

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» কল্যাণ লাভের গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপদেশ ২৮
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ দিশারী
» তোমরা রেখো গো স্মরণ, একদিন হবে যে মরণ! (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ৩০
-জাবির হোসেন

◈ জামি'আহ পাতা
» অহংকার : কারণ ও প্রতিকার ৩২
-সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে
» জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা (পর্ব-৭) ৩৬
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» শুকরিয়া জানাই মহান রবের ৪০
-মাজহারুল ইসলাম আবির

◈ কবিতা ৪২

◈ সংবাদ ৪৩

◈ জামি'আহ সংবাদ ৪৫

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৬

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ইসলাম ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় উদাসীনতা আর অন্য ধর্ম ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় সহযোগিতা- এ কেমন দেশপ্রেম-ধার্মিকতা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সেরা সৃষ্টিজীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রকৃতি এমন যে, তাকে আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই গাইডলাইন দরকার। এই গাইড লাইন দিয়ে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। সন্তানকে অনুপম আদর্শ ও বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের উপর গড়ে তোলা পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু পিতা-মাতা যখন তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না অর্থাৎ সন্তানের উপর তাঁদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থাকে না এবং তাদের গঠন ও দিকনির্দেশনায় শিথিলতা প্রদর্শন করেন, তখন তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। সুতরাং একটি সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ এবং তার শারীরিক ও মানসিক গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

অধিপত্যবাদের চেতনা হিন্দু পণ্ডিতদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। অখণ্ড ভারত মাতার বিশ্বাসে তারা ১৯৪৭ সালের পূর্বের ভারতকে তাদের আবাসভূমি মনে করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে তাদের সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল চিরশত্রু প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করা। সম্পদ ও কর্তৃত্বের অভিজাত্যে দাম্ভিক হিন্দুরা মুসলিমদেরকে দাস মনে করে। এই জন্য তাদের নেতৃস্থানীদের মুখে মুসলিমদেরকে উইপোকা নামের ডাক শুনতে হয়। (মোদি সরকারের আমলে মুসলিমরা কেন ভবিষৎ নিয়ে আতঙ্কিত: ১৬ মে ২০১৯) উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশে তাদের গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের শিশুদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করতে জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন স্তরে ইসলামবিদ্বেষী গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া করতে তাদের নানামুখী কৌশল অব্যাহত আছে। তারা বিভিন্ন নদনদীর পানিপ্রবাহ বন্ধ করে দেশটিকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। প্রতিনিয়ত তারা সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশীদের হত্যা করে চলেছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে করিডোর সুবিধা নিয়ে তারা তাদের পরিবহণ খরচ সাশ্রয় করেছে কিন্তু বিনিময়ে কিছুই দেয়নি। তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্য ঘাটতিটির পরিমাণ ১ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার *(দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট, ২০২৩)*। আদানি গ্রুপের বিদুৎ ক্রয়ের অসম চুক্তির জালে তারা বাংলাদেশকে আটকে রেখেছে। এভাবে বাংলাদেশের উপর ভারতের বহুমুখী আগ্রাসন চলমান আছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর তাদের গোয়েন্দা নজরদারি আছে। আরএসএস এর সহযোগী সংগঠন ইসকন সনাতন ধর্মের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারে দেশব্যাপী তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উন্মুক্ত রাখতে তাদের কার্যক্রম চলমান আছে। যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা করার কথা, সেখানে তারা ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠান প্রধান কিংবা কর্তা ব্যক্তির সহযোগিতায় অন্য ধর্মের আদর্শ ও সংস্কৃতি ইচ্ছায়/অনিচ্ছায় চর্চা করছে। কারণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানরা মুসলিম হলেও তাদের অধিকাংশের চরিত্রে ধর্মহীনতা ও ইসলামবিদ্বেষ বিরাজ। লাম্পট্য ও চরিত্রহীনতার কারণে ছাত্রীদের আন্দলোনের মুখে তাদের পদত্যাগে বাধ্য হওয়া- এখন সচরাচর।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত আধুনিকমনা নামধারী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কিশোর ও তরুণরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আয়োজিত পূজা উদযাপন অনুষ্ঠানে কিংবা হোলি নামক রং খেলায় অংশগ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে তারা ধর্মীয় আদর্শ ও চেতনা ধারণের বিষয়টি একটি অপেক্ষিক বিষয় মনে করে। এরূপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকে তারা আনন্দ উপভোগের অন্যতম মাধ্যম মনে করে। আর এদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে কর্মরত সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এদেরকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। ফলে এরূপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে এড়িয়ে যাওয়ার তাদের সুযোগ কমে যায়।

দেশের নিরাপত্তা ও মৌলবাদ থেকে রক্ষার নামে দেশের কিছু মানুষ জঙ্গি জঙ্গি খেলা খেলায় লিপ্ত। ইসলামের নামে গড়ে উঠা কোনো সংগঠনের ট্যাগ এবং স্বাধীনতাবিরোধীর তকমা লাগিয়ে বিভিন্নভাবে ইসলামী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তির নামে জনগণকে দুই ভাগে ভাগ করে একটিকে প্রগতিবাদী অসাম্প্রদায়িক এবং অন্যটিকে রাজাকার ও মৌলবাদী বলা হচ্ছে। অসাম্প্রদায়িকতার নামে অন্য ধর্মের যে-কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করা হচ্ছে আর ইসলামকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি না নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আরবী বিভাগের একদল শিক্ষার্থী রামাযানকে স্বাগত জানিয়ে কুরআন তেলাওয়াত অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনাসম্বলিত কারণ দর্শানোর নোটিশ ডীন কর্তৃক চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো হয়।

জঙ্গি বা মৌলবাদের তকমা লাগিয়ে কল্যাণকর কাজে সংঘবদ্ধ ছাত্রসমাজের নিরাপত্তা আদায়ের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। বুয়েটে আন্দলনরত শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে যারা আছে তাদের শিবির ও হিযবুত তাহরীরের প্রাক্তন নেতা বলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করছে। অথচ পানির ন্যায্য হিসসা না পাওয়ার কথা লিখার কারণে তাদের সংগঠনের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে আবরার ফাহাদের মতো মেধাবী ছাত্রকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর্থিক অপচয় রোধের নামে এই রামাযানে ইফতার মাহফিল বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, অথচ রাষ্ট্রীয় যাবতীয় কার্যক্রম চলছে। যেখানে হিন্দু ধর্মের পূজা উদযাপন ও আয়োজনে সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনে সহায়তা করা হয়। সেখানে অর্থসংকটের দোহাই দিয়ে ইফতার মাহফিলের মতো মহতী কাজকে বাধাগ্রস্ত করা কতটা সমীচীন তা ভাববার বিষয়।

যখন হিন্দু ধর্মে পূজার সময় হয় তখন হাজার হাজার পূজামণ্ডপ প্রস্তুত হয়। এ সকল মণ্ডপে বহু মুসলিম নেতা-নেত্রীরা পূজা দেখতে যান। অথচ কয়েক বছর আগেও দৃশ্যপট এমন ছিল না। এদেশের হিন্দুগণ তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন বহু বছর থেকে। তখন ঢাকেশ্বরী ও নির্দিষ্ট কিছু মন্দিরে তাদের ধর্ম পালন সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মুসলিম কিংবা নেতাদের উপস্থিতি তেমন একটা দেখা যেত না। কিন্তু কয়েক বছর ধরে তাদের প্রচার-প্রচারণা যেভাবে দেখা যায়, তাতে মনে হয় এটি একটি হিন্দু-প্রধান দেশ।

পূজার উৎসবে উপস্থিত হয়ে জাতীয় নেতারা এমন নীতিবাক্য দেন, এক পর্যায়ে তারা বলেন- ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আর কোনো কোনো নেতার মুখে শোনা যায়, ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎসব সকলের। পূজায় আনন্দ-উল্লাস ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক হয়ে থাকে। তাই এখানে উৎসব-আনন্দ এবং পূজার বিষয়কে পৃথক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। যেমন মুসলিমরা ঈদুল ফিতর ও আযহায় ছালাত এবং কুরবানী করে আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তাই ঈদুল ফিতর ও আযহার আনন্দকে ঈদের ছালাত এবং কুরবানী থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি ঈদের ছালাত ও কুরবানী করে না তার ঈদুল আযহার আনন্দ করার অধিকার নেই। কাজেই ধর্মীয় কাজগুলো মুসলিমদের হলেও উৎসব সকলের এমন কথা বলা যাবে না।

এই গরু নিয়ে কত করুণ কাণ্ডই না ঘটে যাচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু-প্রধান দেশে। সেখানে সরকারি দলের লোকদের হাতে নিহত, নিগৃহীত হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ। শুধু গরুর গোশত খাওয়া বা বহনের অপরাধে একজন মুসলিমকে হত্যা করা হচ্ছে বা শূকরের গোশত খাওয়ানো হচ্ছে; অথচ মুসলিমরা গরু যবেহ করে আনন্দ করে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমদের আনন্দের উৎসব হিন্দুদের জন্য আনন্দের নয়। অপরদিকে তাদের আনন্দের উৎসব আমাদের জন্য আনন্দের হতে পারে না। এতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, এক ধর্মাবলম্বীদের ধর্মভিত্তিক উৎসব অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব হতে পারে না।

উৎসব আর শারঈ আদর্শকে আলাদা করার সুযোগ নাই। ইসলামের ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও আযহার প্রচলনের পটভূমির প্রতি নজর দিলে দেখা যায় যে, ইসলামর পূর্বে মদীনায় নওরোজ ও মেহেরজান নামে দুটি উৎসব চালু ছিল। উক্ত উৎসবদ্বয় পালনের অনুমতি চাওয়া হলে, অনুমতি না দিয়ে আল্লাহর রাসূল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামে বিকল্প দুটি উৎসবের প্রচলন করেন। মুহাররম মাসের ১০ তারিখের ছিয়াম ইয়াহূদীদের সাথে যেন সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে যায়, সেজন্য তিনি এর আগে বা পরে একটি ছিয়াম রাখতে বলেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্ম বা অনুসারীদের সাথে সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ হাদীছে বারবার তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পূজার বিষয়টি বিবেচনা করলে কোনোভাবেই পূজা কার্যক্রমের সাথে একজন মুসলিমের যুক্ত হওয়ার সুযোগ নাই। রাসূলে কারীম ﷺ শুরুর যুগে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেই একত্ববাদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। আর সকল প্রকারের মূর্তিপূজাকে শিরক আখ্যা দিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ দিয়েছেন। সুতরাং আক্বীদাগত দিক থেকে একজন তৌহিদী মুসলিমের কোনোভাবেই মূর্তিপূজা সমর্থন করা এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

তবে ইসলামে অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সহাবস্থান এবং তাদের আরাধনা-উপাসনা নির্বিঘ্নে পালন করতে বাধা প্রদান জায়েয নাই। সুতরাং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্ম পালনের অধিকার এবং ধর্মীয় আচার-আচরণকে এক করে দেখা যৌক্তিক নয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বিষয় এবং এ উপলক্ষ্যে উৎসব ও আনন্দও তাদের নিজস্ব। কিন্তু অপর ধর্মের আচার এবং ধর্মভিত্তিক উৎসবকে নিজের উৎসব মনে করে উক্ত উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। মূর্তিপূজাসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান-উৎসবে কোনো মুসলিমের পক্ষে এভাবে অংশগ্রহণ করা ইসলামের শিক্ষা এবং চেতনাবিরোধী। আল্লাহ বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! *(স.)*

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম ভাষণে ছাহাবীগণের আবেগপ্রবণতা! আর আমরা?

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

সরল অনুবাদ: ইরবায ইবনু সারিয়াহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের ছালাত আদায় করালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে গেলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন, যাতে আমাদের চোখ গড়িয়ে পানি বইতে লাগল। অন্তরে ভয় সৃষ্টি হলো। মনে হচ্ছিল, উপদেশ দানকারীর যেন জীবনের এটাই শেষ উপদেশ। এক ব্যক্তি আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদেরকে আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার, (ইমাম বা নেতার) আদেশ শোনার ও (তাঁর) অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে হাবশী (আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ) গোলাম হয়। (স্মরণ রেখো) আমার পরে তোমাদের যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখবে। এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাতকে ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং এ পথ ও পন্থা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের ভেতরে নতুন নতুন কথার (বিদআত) উদ্ভব ঘটানো হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেকটা নতুন কথাই (বা কাজ শরীআতে আবিষ্কার করা, যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ছাহাবীগণ করেননি তা) বিদআত এবং প্রত্যেকটা বিদআতই ভ্রষ্টতা'।[১]

ব্যাখ্যা: ২৩ বছরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা বাদ রাখেননি। তাই তাঁর জীবন মানুষের জন্য নির্ভেজাল পথপ্রদর্শক এবং জাতির জন্য একটি উজ্জ্বল আলো, যা তাদের পথ আলোকিত করে। তাদের চলার পথে তাদের বাধা ও কষ্টগুলো প্রদর্শন করে, ফলে তাদের চলার পথ মসৃণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 'নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*।

নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মানুষকে সত্যের পথে ডাকা এবং সত্য প্রচারের এমন অভিলক্ষ্য ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে, যতক্ষণ না মহান আল্লাহ ইসলামের আনুষ্ঠানিক বিজয় ঘোষণায় আয়াত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখেন, তখন আপনার পালনকর্তার প্রশংসা করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কারণ তিনি তওবা কবুলকারী' *(আন-নাছর, ১১০/১-৩)*।

উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণের সময় তিনি তাঁর মৃত্যুর চূড়ান্ত সময় অনুভব করেন। তখন তিনি এ বিষয়ে আরও বেশি নিশ্চিত হন, যখন তাঁকে দুনিয়ায় থাকা ও আখেরাতে যাওয়ার মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ সময় তাঁর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যাকুলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং উম্মতের প্রতি তাঁর গভীর দয়া তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে আরও ভাবিয়ে তোলে। তখন তিনি তাদেরকে একটি মর্মস্পর্শী উপদেশ এবং ব্যাপক তাৎপর্যবহ নছীহত করেন, যা তাদের মধ্যে যে কলহ চলমান থাকবে এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তা মোকাবেলার জন্য একটি চমৎকার সমন্বিত পদ্ধতি। যাতে তাঁর এই উপদেশ তাদের জীবন পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

এই মহান উপদেশ ছাহাবীগণের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। দুনিয়া থেকে তাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় যে আসন্ন, তা তারা অনুভব করতে পারেন। তাই তাদের চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে থাকে এবং তাদের হৃদয়ের স্পন্দন ব্যাপক বেড়ে যায়। পরিস্থিতি এতটা সঙ্গিন ছিল যে, তারা বলে ফেলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ যেন বিদায়ী সেনাপতির মর্মস্পর্শী ভাষণ! অতএব, আপনি আমাদের উপদেশ দিন। তারা তাঁর কাছে এমন একটি উপদেশ প্রত্যাশা করেন, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাদের জন্য যথেষ্ট হবে, তাদের সঠিক পথের উপর অটল রাখবে এবং সঠিক রাস্তায় তাদের পথচলা নিশ্চিত করবে। সুতরাং নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশ তাদের জন্য সংগ্রামের সমুদ্রে মুক্তির দিশা হিসেবে কাজ করে। তাক্বওয়া তথা আল্লাহর ভয় নামক গুণের সৃষ্টি করে। কারণ এটি সমস্ত কল্যাণের ধারক এবং প্রত্যেক উপকারী বিষয়ের বাহক। আর যারা দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি চায়, তাদের জন্য এটি একমাত্র সহায়ক। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'নিশ্চয়ই

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. আহমাদ, হা/১৬৬৯৪; আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; তিরমিযী, হা/২৬৭৬, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১৬৫।

আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক তাক্বওয়াবান' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) ঐ অধিকারের প্রতি আলোকপাত করেন, যে অধিকার শরীআত তাকে দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বাণী, 'শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের উপর কর্তৃত্বকারী ব্যক্তি কোনো আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ হয়'। কারণ শ্রবণ ও আনুগত্য এই উভয় অধিকারই একজন শারঈ ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের আছে। এর প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের ইমামদের আনুগত্য করো' *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*।

আর উম্মু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদায় হজ্জে উপদেশ দিতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'হে লোক সকল! আল্লাহকে ভয় করো, শ্রবণ করো এবং আনুগত্য করো। একজন কানকাটা হাবশী কৃতদাসকেও যদি তোমাদের নেতা বানিয়ে দেওয়া হয়, তার আনুগত্য ততক্ষণ করতে থাকো, যতক্ষণ তিনি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন'।[২]

ইমামের কথা শোনা ও তার আনুগত্য করা তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টিকে হাদীছে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং এক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা। তবে তার আনুগত্যের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আছে, যার প্রতি আলোকপাত করা উচিত। তা হলো শারঈ ইমামের আনুগত্য তখনই বাধ্যতামূলক হবে, যখন তিনি শরীআতের বিধান অনুসরণ করবেন এবং মনগড়া কোনোকিছু করবেন না। সুতরাং যদি তার আদেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আইনের পরিপন্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ বলেন, 'পাপ কর্মের ক্ষেত্রে কারও আনুগত্য নয়, শুধু কল্যাণকর কাজে আনুগত্য জায়েয'।[৩] তবে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শারঈ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, 'যদি তোমাদের উপর (আল্লাহর) কোনো বান্দাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়'-এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ দুটি বিষয়ের কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো, যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রীয় শাসনের ভার চলে যায় কিংবা কোনো অত্যাচারী বা মাফিয়া রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা দখল করে নেয় এবং তার ক্ষতি থেকে বাঁচার কোনো উপায় না থাকে, তখন তার ক্ষতি থেকে বাঁচতে তার আনুগত্য আবশ্যক। দ্বিতীয়টি, যেটি তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির আনুগত্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এখন তিনি যদি অনারব হন বা মর্যাদাগত অবস্থানে খুব সাধারণ হন, তবুও তার আনুগত্য করতে হবে। যেমনটি তিনি মসজিদ নির্মাণের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে স্থানের পরিমাণের স্বল্পতা বুঝাতে বিড়ালের থাকার জায়গার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিড়ালের থাকার সমপরিমাণ স্থানে বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর স্থানে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[৪]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরে উম্মতের বিভাজনের ফলে তাদের শক্তি দুর্বল হওয়া এবং হেদায়াত ও সত্য থেকে সরে যাওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ মতভেদ থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা যায়, সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে, সে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবে, সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাহ এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করবে'। তিনি রোগের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এর প্রতিকারের উপায় বলে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সুন্নাহ এবং তাঁর পরে তাঁর সঠিক পথপ্রদর্শক খলীফাদের সুন্নাহকে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর পদ্ধতি অনুযায়ী চলার উপর দৃঢ়তা এবং সত্য জানা ও হেদায়াতের আলো দিয়ে আলোকিত করেছেন, এমনকি তাদের যুগ অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়। এর আলোকে আমরা তাদের হেদায়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃঢ়তা বুঝতে পারি। যখন তিনি বলেছিলেন, 'নাওয়াজিয দ্বারা আঁকড়ে ধরো'। এখানে 'নাওয়াজিয' হলো মাড়ির সবচেয়ে পিছনের দাঁত। সুতরাং এটি সেই পথকে শক্তভাবে ধরা এবং এর থেকে বিচ্যুত না হওয়ার প্রতি কঠিন ইঙ্গিত।

একজন মুসলিমের তার জীবনে যে সুস্পষ্ট ধারণা ও সঠিক আইনগত ভিত্তি অনুসরণ করা উচিত, তা নবী ﷺ-এর এই উপদেশ বহন করে। অতএব, উক্ত হাদীছের আলোকে একজন মুসলিমের রাসূল ﷺ-এর মানহাজ অনুযায়ী চলার জন্য পণ করা উচিত। এর মাধ্যমে উক্ত হাদীছের উপর ধ্যান করার এবং এর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বের করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন- আমীন!

২. তিরমিযী, হা/১৭০৬; আহমাদ, হা/২৭২৬৮।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭।
৪. ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১৬১০।

কার সাথে পর্দা করবেন?

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(মার্চ'২৪ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)
(শেষ পর্ব)

নারী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে পর্দার সীমা কতটুকু?

সম্মানিত পাঠক! উপর্যুক্ত আলোচনায় মাহরাম ও গায়ের মাহরাম তথা বেগানা ও এগানা নারী-পুরুষ সম্পর্কে আমরা একটা সম্যক ধারণা পেয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ। এখন আমাদের জানতে হবে, কোন শ্রেণির সাথে পর্দার বিধান কেমন হবে। নিচে এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হলো—

ইসলামে পর্দার হুকুম: প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্কা মুসলিম নারীর উপর পর্দার বিধান মেনে চলা ওয়াজিব।[১] মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ 'আর যখন তোমরা তাদের (নবীপত্নীগণের) নিকট কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না' *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)*।

ইফকের ঘটনায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছফওয়ান ইবনুল মু'আত্তাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي 'তিনি একজন মানুষের আকৃতি নিদ্রাবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। কেননা, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে তিনি যখন চিনে ফেললেন, তখন তার উচ্চকণ্ঠে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ার আওয়াজে আমি জেগে গেলাম এবং আমি আমার চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলাম'।[২]

অন্য একটি হাদীছে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا [النور: ٣١] 'মহান আল্লাহ প্রাথমিক যুগের মুহাজির নারীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যখন আল্লাহ এ আয়াত 'তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে' *(আন-নূর, ২৪/৩১)* নাযিল করলেন, তখন তারা চাদর ছিড়ে তা দিয়ে ওড়না তৈরি করে নিলেন'।[৩]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ছালাত আদায় করতেন। তখন মুমিন নারীগণ তাঁদের চাদরে সারা শরীর আচ্ছাদিত করে তাঁর সাথে জামাআতে শরীক হতেন। অতঃপর তাঁরা তাঁদের বাড়িতে ফিরতেন, কিন্তু কেউ তাঁদেরকে চিনতে পারতেন না'।[৪]

আসমা বিনতে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ 'বেগানা পুরুষ থেকে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল ঢেকে নিতাম'।[৫] কুরআন মাজীদ ও হাদীছে এরকম আরো বহু দলীল রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَكَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الْأَجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ لَمْ يَرْتَدِعْ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَزْجُرُهُ 'মেয়েদের মুখমণ্ডল এমন জায়গায় খোলা নাজায়েয, যেখানে বেগানা পুরুষ তাদেরকে দেখে ফেলবে। অভিভাবক ও রাষ্ট্রনেতার উচিত, ভালো কাজের আদেশ করা এবং এই মন্দ কাজ ও অন্যান্য মন্দ কাজে নিষেধ করা। এরপরও যে ব্যক্তি নিষেধ শুনবে না, তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে, যে শাস্তি তাকে বিরত রাখতে পারে'।[৬]

গায়ের মাহরাম বা বেগানা নারী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে পর্দার সীমা:

পর্দার মূল জায়গাটাই আসলে গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষ। পর্দা সম্পর্কিত কুরআন-হাদীছের বক্তব্যগুলোর সিংহভাগ এ শ্রেণির জন্যই প্রযোজ্য। সেজন্য, গায়ের মাহরাম বা বেগানা নারী-পুরুষকে পরস্পর সম্পূর্ণ পর্দা বজায় রেখে চলতে

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. মুহাম্মাদ ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী, মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী, ৪/১০৮।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৪১৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৭০।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৫৮।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৭২।
৫. ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৬৯০।
৬. মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ২৪/৩৮২।

হবে। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বজায় থাকলে তাকে পরিপূর্ণ পর্দা বলা যাবে:

(১) সম্পূর্ণ শরীর আবৃত থাকতে হবে: একজন নারীকে গায়ের মাহরাম বা বেগানা কোনো পুরুষের সামনে আপাদমস্তক সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*। উল্লেখ্য, জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক, যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে। উক্ত আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَيْ: لَا يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلْأَجَانِبِ، إِلَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ 'অর্থাৎ যা লুকানো যায় না, তা ছাড়া সৌন্দর্যের কোনো কিছুই তারা বেগানা পুরুষের সামনে প্রকাশ করতে পারবে না'।[৭]

(২) পোশাক এমন সৌন্দর্যপূর্ণ হওয়া যাবে না, যা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে: মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ 'তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। আয়াতাংশটি এমন ডিজাইনের পোশাককেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা পুরুষের নজর কাড়ে। এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, সৌন্দর্য ঢাকার জন্যই যে পোশাক, তা নিজেই যদি দৃষ্টি আকর্ষণকারী সৌন্দর্যপূর্ণ হয়, তাহলে তা দিয়ে পর্দা হবে কীভাবে?!

(৩) পোশাক পুরু হতে হবে, যা শরীরের রং প্রকাশ করবে না: কারণ পাতলা পোশাকে পর্দা হয় না; বরং ফেতনা আরো বাড়িয়ে দেয়। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَنُوهُنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ 'আমার উম্মতের শেষ যামানায় এমন নারীদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা বস্ত্র পরিহিতা হওয়া সত্ত্বেও উলঙ্গ। তাদের মাথার উপর বুখতী উটের উঁচু কুঁজের ন্যায় খোঁপা থাকবে। তাদেরকে অভিশাপ দাও।[৮] কারণ তারা অভিশপ্ত'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا 'তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে'।[১০]

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর দ্বারা) সেসব নারীকে উদ্দেশ্য করেছেন, যারা এমন পাতলা পোশাক পরে, যা (দেহের) বিবরণ তুলে ধরে, আবৃত করে না। তারাই নামে পোশাক পরিহিতা, কিন্তু বাস্তবে উলঙ্গ'।[১১]

(৪) পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে: কারণ পোশাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফেতনা দূর করা। আর ঢিলেঢালা পোশাক ছাড়া ফেতনা দূর করা সম্ভব নয়। টাইট পোশাক শরীরের রং ঢাকলেও শরীরের আকার প্রকাশ করে দেয়, যা ফেতনার বড় কারণ এবং পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট। সেজন্য, পোশাক ঢিলেঢালা হওয়া আবশ্যক। পূর্বের পয়েন্টে উল্লিখিত হাদীছ দু'টি এখানেও প্রযোজ্য।

(৫) পোশাক সুগন্ধিযুক্ত হওয়া যাবে না: নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের সুগন্ধি মেখে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ 'যে কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের পাশ দিয়ে গমন করে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যভিচারিণী'।[১২] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا 'তোমাদের মহিলাদের যে কেউ মসজিদে গেলে সে যেন সুগন্ধির ধারেকাছেও না যায়'।[১৩]

এর মূল কারণ হচ্ছে, যে কোনো পুরুষ সুগন্ধির সূত্র ধরে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং যে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যেতে পারে।[১৪]

(৬) নারীর পোশাক পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া যাবে না: নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরলে তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পুরুষকে অভিশাপ করেছেন, যে নারীর পোশাক পরে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেছেন, যে পুরুষের পোশাক পরে'।[১৫] অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ 'যে নারী পুরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যে পুরুষ নারীর সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৬]

৭. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৬/৪৫।
৮. তবে নির্দিষ্টভাবে কাউকে অভিশাপ দেওয়া যাবে না।
৯. আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৯৩৩১, 'সনদ হাসান'।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।
১১. সুয়ূত্বী, তানবীরুল হাওয়ালেক, ৩/১০৩।
১২. সুনানে নাসাঈ, হা/৫১২৬, 'হাসান'।
১৩. সুনানে নাসাঈ, হা/৫২৬২, 'ছহীহ'।
১৪. দ্রষ্টব্য: ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ২/৩৪৯।
১৫. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪০৯৮, 'ছহীহ'।
১৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৮৭৫, 'ছহীহ'।

www.al-itisam.com

(৭) কাফের নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া যাবে না: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে চলে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’।[১৭] তাছাড়া ইসলামী শরীআতের একটি সুবিদিত মূলনীতি হচ্ছে, নারী-পুরুষ কোনো মুসলিমের জন্য কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না।

(৮) প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জনের পোশাক হওয়া যাবে না: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতি অর্জনের পোশাক পরবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন’।[১৮-১৯]

পরিপূর্ণ পর্দার জন্য আরো যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে—

(৯) বেগানা পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলা পরিহার করতে হবে: মেয়েদের কণ্ঠ নিচু হতে হবে। প্রয়োজনে পুরুষের সাথে কথা বলা যাবে, তবে কোমল কণ্ঠে বলা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ‘হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করো, তবে (বেগানা পুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, সে প্রলুব্ধ হবে। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৩২)*।

(১০) দৃষ্টি নিচু রাখতে হবে: মহান আল্লাহ মুমিন পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ‘মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত’ *(আন-নূর, ২৪/৩০)*। পরের আয়াতে তিনি মুমিন নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ ‘মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

(১১) এমন অঙ্গভঙ্গি করে চলা যাবে না, যাতে বেগানা পুরুষের নজর কাড়ে: মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ‘আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

(১২) গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষের নির্জনে একত্রিত হওয়া যাবে না এবং গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে কোথাও সফর করা যাবে না: এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ‘অবশ্যই কোনো পুরুষ যেন কোনো মহিলার সঙ্গে নির্জনে একত্রিত না হয় এবং কোনো মহিলা যেন কোনো মাহরাম পুরুষসঙ্গী ছাড়া সফর না করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হাজ্জযাত্রী। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘তাহলে যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করো’।[২০]

অস্থায়ী ও স্থায়ী মাহরামের মাঝে পার্থক্য পার্থক্য করা জরুরী: মূলত অস্থায়ী মাহরাম প্রকৃত মাহরাম নয় এবং তাদের সাথে প্রকৃত মাহরামদের মতো চলাফেরা বৈধ নয়। স্থায়ী মাহরাম নারীদের সাথে যা যা বৈধ, তার কোনোটাই অস্থায়ী মাহরাম নারীদের সাথে বৈধ নয়। কিন্তু এখানেই অনেকেই ভুল করে থাকে। অস্থায়ী মাহরাম নারীদেরকে স্থায়ী মাহরাম নারীদের মতো গণ্য করে তাদের সাথে নির্জনে মিলিত হয়, দেখাদেখি করে, একসাথে ভ্রমণে বের হয়, ঘোরাঘুরি করে ইত্যাদি। অথচ এগুলোর কোনোটাই অস্থায়ী মাহরামদের ক্ষেত্রে বৈধ নয়।

মাহরাম নারী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে পর্দার সীমা:

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ ‘আর যা সাধারণত প্রকাশ পায়, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ... ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

---

১৭. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, ‘হাসান-ছহীহ’।

১৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৩৬০৭, ‘হাসান’।

১৯. উপর্যুক্ত ৮টি শর্ত আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আলবানী, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, পৃ. ৫৪-৬৭।

২০. ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪১।

www.al-itisam.com

উক্ত আয়াতের তাফসীরে আবূ বকর আল-জাছ্ছাছ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আয়াতটির স্পষ্ট দাবি হচ্ছে, স্বামীর সামনে এবং স্বামীর সাথে পিতাসহ যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে। আর সুবিদিত যে, এখানে সৌন্দর্যের জায়গা হচ্ছে, চেহারা, হাত, বাহু। ফলে আয়াতটির দাবি হচ্ছে, এতে উল্লিখিত পুরুষদের জন্য উপর্যুক্ত জায়গাগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ’।[২১]

এখানে আমি সঊদী আরবের গবেষণা ও ফতওয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটির ফতওয়া উল্লেখ করতে চাই, যার মাধ্যমে নারীদের পরস্পরের মাঝে এবং নারী ও তাদের মাহরাম পুরুষদের মাঝে পর্দার সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সঊদী আরবের গবেষণা ও ফতওয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘ইসলামের সূচনালগ্নে মুমিন নারীগণ চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা এবং লজ্জাশীলতা ও শালীনতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এর মূল কারণ ছিল মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ। সে সময় নারীগণ গোটা দেহ আবৃতকারী পোশাক পরতেন। তারা পরস্পর মিলিত হলে বা তাদের মাহরাম পুরুষদের সাথে মিলিত হলে খোলামেলা পোশাক পরা তাদের অভ্যাস ছিল না। অতি নিকট অতীত পর্যন্ত যুগের পর যুগ নারীগণ এই সঠিক ও যথার্থ নিয়মের উপরেই ছিলেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে অনেক নোংরামি ঢুকে পড়েছে।

নারীদের একে অপরের দিকে তাকানোর এবং নিজেদের মাঝে পোশাক-পরিচ্ছদের সীমারেখা কী হবে, সে বিষয়ে ফতওয়া বোর্ডের কাছে প্রচুর প্রশ্ন আসে। সেকারণে ফতওয়া বোর্ড স্পষ্ট বলতে চায়, নারীদের লজ্জাশীলতা অর্জন করতে হবে, যেটিকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈমানের অন্যতম শাখা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর শরীআত নির্দেশিত ও সামাজিকভাবে প্রচলিত সেই লজ্জাশীলতার অংশ হচ্ছে, নারীর নিজেকে আবৃত রাখা ও শালীনতা বজায় রেখে চলা এবং এমন চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, যা তাকে ফেতনা ও সংশয়ের জায়গা থেকে দূরে রাখবে।

কুরআন মাজীদের স্পষ্ট বক্তব্য প্রমাণ করে, একজন নারী অপর নারীর সামনে কেবল ততটুকু উন্মুক্ত করতে পারে, যতটুকু তার মাহরাম পুরুষের সামনে উন্মুক্ত করতে পারে। আর তা হচ্ছে, বাসা-বাড়িতে এবং কাজ করতে যেয়ে সাধারণত যতটুকু উন্মুক্ত হয়, ততটুকু। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ ‘আর যা সাধারণত প্রকাশ পায়, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ... ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

যেহেতু কুরআনের এই বক্তব্যই হাদীছেরও বক্তব্য, তাই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ, ছাহাবীগণের স্ত্রীগণ এবং তাদের উত্তম অনুসারী নারীগণ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীগণ এই আমলের উপরেই ছিলেন। **উপর্যুক্ত শ্রেণির পুরুষগণের সামনে সাধারণত যা উন্মুক্ত রাখা যায়, তা হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাসা-বাড়িতে ও কাজ করতে গেলে যা প্রকাশ পায় এবং যেখান থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন। যেমন— মাথা, দুই হাত, গলা, দুই পায়ের পাতা। এর বাইরে অন্য কোনো অঙ্গ বের করার বৈধতার পক্ষে কুরআন বা হাদীছ থেকে কোনো দলীল পাওয়া যায় না।** তাছাড়া এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ফেতনার পথ খুলে যায়, অন্যদিকে তেমনি এটি অন্য নারীদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

তদুপরি এর মাধ্যমে কাফের, ব্যভিচারিণী ও পোশাক-পরিচ্ছদে নির্লজ্জ নারীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে চলে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’।[২২] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পরনে দু’টি বিশেষ কুসুম রঙের কাপড় দেখে বলেন, إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ‘এগুলো কাফেরদের পোশাকের মধ্যে গণ্য। সুতরাং তুমি তা পরো না’।[২৩] অপর হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ‘দুই শ্রেণির জাহান্নামী, যাদেরকে আমি দেখিনি। এক শ্রেণির ঐ সমস্ত মানুষ, যাদের নিকট গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকদের প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণির ঐ সমস্ত মহিলা, যারা বস্ত্র পরিহিতা

২১. আহকামুল কুরআন, ৫/১৭৪।

২২. সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, ‘হাসান-ছহীহ’।
২৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৭৭।

www.al-itisam.com

হওয়া সত্ত্বেও উলঙ্গ, আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। যাদের মাথার খোঁপা বুখতী উটের উঁচু কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূরত্বে থেকে পাওয়া যাবে'।[২৪]

'বস্ত্র পরিহিতা হওয়া সত্ত্বেও উলঙ্গ'— এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, নারী এমন পোশাক পরে, যা তাকে আবৃত করতে পারে না। সেজন্য সে পোশাক পরিহিতা হলেও বাস্তবে সে উলঙ্গ। যেমন- এমন পাতলা পোশাক, যা দেহের রং প্রকাশ করে দেয় বা এমন সংকুচিত পোশাক, যা দেহের উঁচু-নিচু জায়গা প্রকাশ করে দেয় অথবা এমন খাটো পোশাক, যা দেহের কোনো কোনো অঙ্গ অনাবৃত রাখে।

অতএব, মুসলিম নারীদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, সেই হেদায়াতের পথ আঁকড়ে ধরে থাকা, যার উপর নবীপত্নীগণ, ছাহাবাপত্নীগণ এবং তাদের যথার্থ অনুসারী নারীগণ অটল ছিলেন। তাদের উচিত, নিজেদের আবৃত রাখা এবং শালীনতা বজায় রেখে চলা। তবেই তারা ফেতনার ফাঁকফোকড় থেকে অধিকতর দূরে থাকতে পারবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না উদ্দীপক ও অশ্লীলতার প্রণোদনাদায়ক বিষয়াবলি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে।

অনুরূপভাবে মুসলিম নারীদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের স্বার্থে এবং মহান আল্লাহর প্রতিদানের আশায় ও শাস্তির ভয়ে সেসব পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে সতর্ক থাকা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম করে দিয়েছেন; যেসব পোশাকে কাফের ও পতিতাশ্রেণির নারীর সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন হয়।

অতএব, প্রতিটি মুসলিম অভিভাবকের উপর আবশ্যক হচ্ছে, তাদের অধীনস্থ নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। তারা যেন তাদের অধীনস্থ নারীদেরকে এমন পোশাক পরতে না দেন, যা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম করে দিয়েছেন; যেসব পোশাক নগ্নতা ও ফেতনার দিকে আহ্বান করে। প্রত্যেক অভিভাবকের জেনে রাখা উচিত, তিনি একজন দায়িত্বশীল এবং ক্বিয়ামতের দিন তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[২৫]

অতএব, নারীর বক্ষদেশ, পেট, পিঠ, উরু ইত্যাদি মাহরাম পুরুষের সামনে উন্মুক্ত করা এবং সেদিকে তাকানো জায়েয নেই।[২৬]

মাহরাম নারী-পুরুষের নির্জনে অবস্থান করা, সফর করা, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করা ইত্যাদি জায়েয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ। 'অবশ্যই কোনো পুরুষ যেন কোনো মহিলার সঙ্গে নির্জনে একত্রিত না হয় এবং কোনো মহিলা যেন কোনো মাহরাম পুরুষসঙ্গী ছাড়া সফর না করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হাজ্জযাত্রী। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করো'।[২৭]

উল্লেখ্য, মাহরাম পুরুষগণ সবাই এক ধরনের নয়। বরং ঘনিষ্টতা ও ফেতনামুক্ত থাকার দিক থেকে তাদের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। সেকারণে একজন নারী তার পিতার সামনে যতটুকু প্রকাশ করতে পারে, তার স্বামীর অন্য স্ত্রীর সামনে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে না। ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ যথার্থই বলেছেন, 'মহান আল্লাহ প্রথমে স্বামীদের কথা বলেছেন, অতঃপর অন্যান্য মাহরাম পুরুষের কথা বলেছেন আর সৌন্দর্য প্রকাশের দিক থেকে তিনি সবাইকে সমান গণ্য করেছেন। তবে মানুষের হৃদয় গহীনে যা লুক্কায়িত থাকে, তা বিবেচনায় মাহরাম পুরুষদের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। অতএব, কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন নারীকে তার পিতা ও ভাইয়ের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের চেয়ে অন্য স্বামীর সন্তানের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। সেকারণে মাহরাম পুরুষদের সামনে কতটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে, তার স্তরও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে পিতার সামনে যা প্রকাশ করা যাবে, স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানের সামনে তা প্রকাশ করা যাবে না'।[২৮]

তবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে সহবাসের অঙ্গ ও সময় সম্পর্কিত কিছু বিধিনিষেধ ছাড়া তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। রাসূল ﷺ বলেন, احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ 'তোমার লজ্জাস্থান আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের থেকে হেফাযত করবে'।[২৯]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে মাহরাম-গায়ের মাহরাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে এ সম্পর্কিত বিধিবিধান বাস্তবায়নের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।
২৫. ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১৭/২৯০-২৯৪।
২৬. দ্রষ্টব্য: ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ৭/৯৮।
২৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪১।
২৮. তাফসীর কুরতুবী, ১২/২৩২।
২৯. সুনানে তিরমিযী, হা/২৭৬৯; সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪০১৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/১৯২০, 'হাসান'।

আল্লাহর ভালোবাসা

-মুস্তফা মনজুর

[ক]

গল্প- এক চাষা একবার বিয়ের সাজে সেজে রাজার বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। পথে যে-ই যাচ্ছে, সে-ই জিজ্ঞেস করছে, ব্যাপার কী? চাষার একই উত্তর, 'রাজকন্যাকে খুব ভালোবাসি তো, তাই তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি; বিয়ে প্রায় ফাইনাল'। জবাব শুনে অধিকাংশ লোকই হতবাক!!! একজন জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, বুঝলাম আপনি ভালোবাসেন, কিন্তু রাজকন্যা বাসে তো?' চাষার নির্লিপ্ত জবাব, 'তা জানি না'।

প্রিয় ভাই! বিয়ে কি হবে? উত্তর 'না' হওয়ারই কথা। খুব যারা আশাবাদী তাঁরা হয়তো ভাববেন, বর যেহেতু রাজী তাহলে তো বিয়ের অর্ধেক কাজ শেষই, তাই না? কিন্তু বাস্তবতা নিশ্চিতই ভিন্ন। কারণ ভালোবাসা এমন এক জিনিস, যা একতরফাভাবে পূর্ণতা লাভ করে না। তাই চাষা যতই আশাবাদী হোক, এটাকে ভালোবাসা না বলে পাগলামি বলাই সম্ভবত যুক্তিযুক্ত।

[খ]

লিখার শিরোনাম দিয়েছিলাম 'আল্লাহর ভালোবাসা'। সচেতনভাবেই, এটা দ্বিমাত্রিক— প্রথমত, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। আর দ্বিতীয়ত, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ দু'দিক থেকেই ভালোবাসা।

গোটা দুনিয়ায় সম্ভবত এমন কোনো মুসলিম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বলবে, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি না। কারণ আল্লাহকে ভালো না বাসলে যে, ঈমানই থাকে না। কেননা মুহাব্বতের প্রথম ভাগই 'আল্লাহর মুহাব্বত'। ঈমানের জন্যই এটা শর্ত।

পাশাপাশি ঈমানের পূর্ণতার জন্য শর্ত 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা'। যতক্ষণ না আল্লাহর জন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে ভালোবাসা হবে, আর আল্লাহর জন্যই কারো প্রতি কিংবা কোনো কিছুর প্রতি ঘৃণা করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এক্ষেত্রে সর্বপ্রধান হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মুহাব্বত; তাঁর সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসা।

আমরা আল্লাহকে, তাঁর রাসূল ﷺ কে মুহাব্বত করি; মুহাব্বতের দাবি করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের কবুল করুন।

[গ]

ভালোবাসার নিয়মনীতির অন্যতম হচ্ছে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন; তার হাজারো নমুনা দৃশ্যমান। যেমন- তিনিই লালনপালন করেন, নানা নেয়ামত দান করেন, দয়া করেন, ক্ষমা করেন। সবই তো ভালোবাসার প্রকাশ।

বলতে পারেন, এসব তো তিনি কাফেরদেরও করেন। হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে মুমিনদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশও আছে। যারা ঈমানদার, তাঁরা তা বুঝতে পারেন। দরিদ্রতা ও অসুস্থতাকে ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে নেওয়া আমরা হয়তো বুঝি না; কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম বুঝতেন, সালাফে ছালেহীন বুঝতেন, এযুগের পূর্ণ ঈমানদারগণও বুঝেন।

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা নেন এটাও এক ধরনের ভালোবাসা। কেননা তিনি আমাদের মর্যাদা উচ্চ করতে চান, নেয়ামত বাড়িয়ে দিতে চান। নইলে পাপ করে তওবাকারী কীভাবে আগের চাইতে বেশি মর্যাদাবান হয়? দুনিয়ার কোনো হিসেবে কি মেলে? চাকরিতে ভুল করে ক্ষমা চাইলে কি প্রমোশন হয় কখনো?

প্রিয় ভাই! দেখুন ক্লাসে কোন্ ছাত্রকে শিক্ষক বেশি কাজ দেন, পড়া জেজ্ঞেস করেন? নিশ্চয়ই ভালো ছাত্রকে। কেন? ছাত্রের মঙ্গলের জন্যই। আর খারাপ ছাত্রকে বেশি কাজ না দেওয়া তাকে সুবিধা দেওয়া নয়; বরং তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া। কাফেরদের ক্ষেত্রে আল্লাহ দুনিয়াতে এমনই করে থাকেন।

কিংবা ধরে নিন, আপনার কোম্পানিতে নতুন কোনো ইভেন্ট করবেন। দায়িত্ব কাকে দেবেন? যে আপনার বিশ্বস্ত, যাকে

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আপনি ভালো জানেন ও যোগ্যতাসম্পন্ন। তাকেই তো? কাজ শেষ হয়ে গেলে পুরস্কারও নিশ্চয় তিনিই পাবেন। আর যদি তিনি চ্যালেঞ্জ না নেন, পুরস্কার সম্ভবত অন্যের ভাগ্যেই জুটবে।

আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা মুমিনদের জন্য এমনই। এমন কোনো পরীক্ষা তিনি নেন না, যাতে তাঁর ভালোবাসা লেগে থাকে না। এজন্যই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার শিকার হয়েছেন নবীগণ, তারপর পর্যায়ক্রমে তাক্বওয়াবানগণ।

প্রিয় ভাই! আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসার আরো একটি প্রমাণ রেখে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, তিনি যাকে ভালোবাসেন, সকল মানুষের মাঝে সে ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেন। টাকাপয়সা নেই, উচ্চতর ডিগ্রি নেই, ক্ষমতা কিংবা বড় চাকরি নেই, নেই গাড়ি-বাড়িও, কিন্তু সমাজে তাঁর সম্মান আছে, লোকজন তাঁকে ভালোবাসে— এমন নযীর আমাদের আশেপাশেই বিদ্যমান। একটু খুঁজলেই হয়তো পেয়ে যাব। কারণ? আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবেসেছেন। মানুষ কি আর ভালো না বেসে পারে?

[ঘ]

আমরা দাবি করি, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। কিন্তু প্রকাশের দিক থেকে আমরা বড়ই কৃপণ। আমরা শুধু মুখে বলেই এই ভালোবাসা প্রকাশ করি। কাজে-কর্মে তেমন কোনো প্রকাশ দেখি না। হ্যাঁ, অনেক সময় বিশাল মিছিল-মিটিং, ওয়ায-মাহফিলে যোগদান কিংবা মীলাদ-ক্বিয়ামের আয়োজন করেই মনে করি ভালোবাসার প্রকাশ হয়ে গেল। এতেই মুহাব্বতের হক্ব সর্বোত্তম উপায়ে আদায় করছি বলে মনে করি।

প্রিয় ভাই! একবারও ভেবে দেখি না— এসব কি সত্যিই ভালোবাসার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য? আল্লাহ তাআলার পছন্দও কি এই? ইসলাম নির্দেশিত পন্থাও কি এগুলো?

উত্তর আপনাদের হাতেই তোলা থাকল।

[ঙ]

অনেকে বলে, 'ছালাত না পড়লে কি হবে ঈমান শক্ত আছে' কিংবা 'সুন্নাহ না মানতে পারলেও আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, তাঁর রাসূলকে ﷺ ভালোবাসি'।

প্রিয় ভাই! 'মুহাব্বতই সবকিছু (আমলের দরকার নেই)' এমন বক্তব্য ইসলামের না। এটা 'ভক্তিতে মুক্তি' চেতনারই অন্য প্রকাশ। সনাতনধর্মী বা খ্রিষ্টানদের এসব বক্তব্য ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামে এমন নযীর একটিও নেই, যেখানে কোনো ছাহাবী, কিংবা কোনো তাবেঈ নতুবা কোনো তাবে-তাবেঈ অথবা আমাদের পুণ্যবান সালাফগণ শুধু ভালোবাসার কথা বলে গেছেন, আমলের কথা বলেননি বা নিজে আমল ত্যাগ করেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার নযীরও আমরা তাঁদের মধ্যে খুব একটা দেখি না, সেখানে শুধু মুহাব্বত দিয়ে কীভাবে নাজাত সম্ভব আমার জ্ঞানে ধরে না!

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা চাইলে যে কাউকেই ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে সেটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন।

প্রিয় বন্ধু! 'ভক্তিতেই মুক্তি' শ্লোগানের ফলে সনাতন আর খ্রিষ্টান ধর্মের কী হাল, তা তো নিজের চোখেই দেখছেন। এখন সেসব শুধু আচার সর্বস্ব ধর্ম হিসেবেই আছে।

এমনই হবে যদি আমল বাদ দিয়ে শুধু মুহাব্বতের ফেরিওয়ালাদের হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দেওয়া হয়। সমাজে যত বিদআত আর বিতর্ক এসবের মূল কারিগরও কিন্তু এরাই।

[চ]

প্রিয় ভাই! এবার দেখি ভালোবাসা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কী বলেছেন— 'বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

উক্ত আয়াত আমরা প্রায় সবাই জানি, অর্থও শুনেছি। কিন্তু গভীরভাবে ভাবিনি হয়তো কোনোদিন। প্রিয় ভাই! আল্লাহর মুহাব্বতের সার্বিক রূপরেখা এই আয়াতে বিদ্যমান।

একদা একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। বলা

হয়- যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রিয় নবী ﷺ-এর অনুসরণ করো। হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এটা হলো পরীক্ষা, তাদের ঈমানের'। অর্থাৎ দেখা হবে তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে কি-না? ইমাম ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'এই আয়াত সকলের জন্যই মানদণ্ড, যারা আল্লাহর মুহাব্বতের দাবি করে। যদি কেউ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ত্বরীক্বার উপর না থাকে, তবে সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী'। তাফসীরে তবারীর ভাষ্যমতে, নবী ﷺ-এর অনুসরণ হচ্ছে আল্লাহর মুহাব্বতের আলামত।

প্রিয় ভাই! এবার সম্ভবত পরিষ্কার যে, কীভাবে আল্লাহর মুহাব্বত প্রকাশ করব। একটাই উপায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ। ছাহাবায়ে কেরাম করেছেন সেভাবে; নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে যেভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে; সকল কাজে-কথায় ও আচরণে। এটাই মানদণ্ড কে আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসে তার। যার সুন্নাহর অনুসরণ বেশি, তিনি আল্লাহকে বেশিই ভালোবাসেন। আর যার কম, তার নিজেকে প্রশ্ন করাই মঙ্গলজনক।

[ছ]

আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ। কেননা আল্লাহ দুনিয়াতে দৃশ্যমান সত্তা নন, তাঁকে অনুসরণও করা যায় না। এজন্য ভালোবাসার প্রকাশ মানুষের জন্য সহজ করে দিয়েছেন, যেন মানুষ আমল করতে পারে।

সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা নিজের ভালোবাসার নিশ্চয়তাও দিয়েছেন। এখানেও তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এখানে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ ভালোবাসার শর্ত করেননি; শর্ত করেছেন আমল।

কারণ অন্তরের উপর মানুষের যতটা নিয়ন্ত্রণ, তার চাইতে বেশি আমলের উপর। সুতরাং কেউ যদি যথার্থভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে সক্ষম নাও হয়, কিন্তু সুন্নাহর অনুসরণে পূর্ণাঙ্গভাবে করতে পারে, তবে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে ভালোবাসবেন, আর তার ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। বান্দার দিক থেকে ভালোবাসার অপূর্ণতা আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসা দিয়ে ঢেকে দেবেন। সুবহানাল্লাহ!! কতই মহান আমাদের মালিক!!

[জ]

প্রিয় ভাই! এবার সময় নিজের অবস্থা যাচাইয়ের। আত্মজিজ্ঞাসা করি— আল্লাহর প্রতি আমার ভালোবাসা কেমন ও কতটুকু? তা নিজের পছন্দমতো কাজ দিয়ে, না-কি আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়? আর আল্লাহ তাআলাই কি আমাকে ভালোবাসেন?

শেষ প্রশ্নটুকু কিন্তু ভুলে যাবেন না। সারা জীবন আপনি আল্লাহকে ভালোবেসে গেলেন— তবে নিজের পন্থায়; কুরবানী করলেন, কষ্ট করলেন, নিজের মনগড়াভাবে। অথচ আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পেলেন না? এমন হলে কী হবে? দুনিয়াও বরবাদ, আখেরাতও বরবাদ।

প্রিয় ভাই! মাআযাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন হওয়া থেকে হেফাযত করুন। সাথে সাথে আমাদেরও সতর্ক হওয়া উচিত, নিজেদের কাজ আর আমলের হিসাব নেওয়া। এখনো যদি না করি, তবে তো চাষার মতোই আমাদের অবস্থা। লোকজন আমাকে পাগল ভাববে; আর আমি ভাবব কাজ তো হয়েই গেছে, সামান্যটুকু মাত্র বাকী!!!

প্রিয় ভাই! জানি প্রিয় নবী ﷺ-এর অনুসরণে আমরা অনেক দূরে। কিন্তু তা তো অসম্ভব নয়, আর আল্লাহ তাআলাও এতে সাহায্য করবেন নিশ্চিতরূপেই। একটি একটি করেই না হয় সুন্নাহ পালন শুরু করি। একদিন হয়তো নবী ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ করতে পারব।

সেদিন আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসার দাবি সত্য হবে; আর প্রতিদান যা পাব তা না হয় নাই-বা বললাম। থাক না কিছু গোপনই। দয়াময় যা দিবেন, তা তো আর বলে বুঝানো যাবে না। তাঁর মতোই অসীম আর অবিস্মরণীয় আনন্দের উৎসই হবে সে দান। মুমিন হৃদয় তো সে প্রতীক্ষাতেই বাঁচে।

ইক্বামাতুছ ছালাত ও আমাদের শিক্ষা

-রফিকুল আলম আজাদ*

তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত যেভাবে ছালাত আদায় করতে হয়, ঠিক সেভাবে আদায় করাকে ইক্বামাতুছ ছালাত বলে। কেউ কেউ বলেন, ছালাতের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো খুশূ-খুযূ সহকারে যথাযথভাবে আদায় করাই হলো ইক্বামাতুছ ছালাত। যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম ছালাত এবং শেষ বিচারের দিন প্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে।[১] তাই যেনতেনভাবে আদায়কৃত ছালাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'তোমরা ঐভাবে ছালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখো'।[২] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীছের গ্রন্থসমূহে ছালাত সম্পর্কিত যত ছহীহ হাদীছ আছে, তা বর্জন ও সংযোজন ব্যতীত অনুসরণ করতে হবে আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পঠিত ছালাত সেভাবে পড়তে হবে, যেভাবে তিনি পড়েছেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সে ব্যক্তি, যে ছালাতে চুরি করে'। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কীভাবে সে ছালাতে চুরি করে? তিনি বললেন, 'সে ছালাতের রুকূ ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না'।[৩]

নিছক আনুষ্ঠানিকতায় ছালাত ক্বায়েম হয় না, বরং মানুষের আচরণ ও বিশ্বাসের সার্বিক পরিবর্তনই হলো ইক্বামাতুছ ছালাত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ 'নিশ্চয় মুমিনরা সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়ী ও নম্র। যারা বাজে কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে। যারা যাকাত প্রদানের ব্যাপারে তৎপর হয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাযত করে। তবে তাদের স্ত্রীদের ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে হেফাযত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে যদি কেউ এদের ছাড়া অন্য কাউকে (যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য) কামনা করে তবে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। যারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করে। যারা তাদের ছালাতসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে। তারাই উত্তরাধিকারের প্রতিদান হিসাবে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে' *(আল-মুমিনূন, ২৩/১-১১)*।

ছালাতে উক্ত আয়াতগুলো পড়া হবে আর বাস্তব জীবনে এর শিক্ষা বাস্তবায়িত হবে না তা হতে পারে না। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হলো পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।[৪]

ইবাদত কবুলের প্রথম শর্ত হলো, শিরকমুক্ত ঈমান। দ্বিতীয় শর্ত হলো, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদত আদায়। তৃতীয় শর্ত হলো, ইখলাছ বা আন্তরিকতা থাকা। ঈমান হলো অন্তরের ইবাদত আর ছালাত হলো শারীরিক ইবাদত। অহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমাল করল, যার উপর আমার কোনো অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখাত'।[৫] মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

* বসুন্ধরা প্লাজা, কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোড, বরিশাল।

১. তিরমিযী, হা/৩৮৮।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩১; মিশকাত, হা/৬৮৩।
৩. দারেমী, হা/১৩৬৪।
৪. মিশকাত, হা/৪৯৯২।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭।

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের ﷺ আনুগত্য করো আর তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৩)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে বিদআত আবিষ্কার করবে কিংবা কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা‘নত। তার কোনো ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবুল হবে না।[৬] এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ ‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(আল-জিন, ৭২/২৩)*। তিনি আরও বলেন, ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ *(আন-নিসা, ৪/৮০)*। কুরআনুল কারীমে বারবার আল্লাহর আনুগত্যের সাথে রাসূল ﷺ-এর অনুগত্যের কথা বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যে পার্থক্য করবে, তাদের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তারা জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করবে। আল-কুরআনের ৫০টিরও বেশি স্থানে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ-এর অনুগত্যের কোনো বিকল্প নেই। এখন প্রশ্ন— যদি রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীছও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় আর তারপর তা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে কি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নাফরমানী হলো না? মহান আল্লাহ স্পষ্টতই বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করবে না তাদের সমস্ত আমল এমনকি ছালাতও বরবাদ হয়ে যাবে। তারা কাফের হিসেবে গণ্য হবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। ছালাত হোক কিংবা অন্য কোনো আমল হোক যদি রাসূল ﷺ অনুমোদিত পন্থায় না হয়, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে।

যেমন- যদি কবর যিয়ারতে একবার সূরা আল-ফাতেহা, ৩ বার আল-ইখলাছ, ১১ বার দরূদ পাঠ করা হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সিলেটের একটি গোরস্থানের বিলবোর্ডে লেখা আছে, বিসমিল্লাহ ৭ বার, আস্তাগফিরুল্লাহ ৭ বার, দরূদ ১১ বার, আল-ফাতেহা ৩ বার, আন-নাস ৩ বার, আল-ফালাক্ব ৩ বার, আল-ইখলাছ ৩ বার, আল-কাফেরূন ৩ বার, আত-তাকাছুর ৩ বার, আয়াতুল কুরসী ৩ বার পড়ে কবর যিয়ারতের কথা।[৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমাল করল যা আমাদের দ্বীনে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[৮] কবর যিয়ারতের এই পদ্ধতির অনুমোদন কি ইসলামে আছে? এক্ষেত্রে ছাহাবীগণ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-কে রাসূল ﷺ দু‘আ শিখিয়ে দিতেন— السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ অর্থ: ‘হে কবরবাসী মুমিন-মুসলিম! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি— ইনশা-আল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি’।[৯] মাজলিস শেষে সূরা আল-ফাতেহা ১ বার, আল-ইখলাছ ৩ বার, দরূদ ১১ বার তারপর হাত তুলে ইচ্ছামতো দু‘আ করার পদ্ধতি রাসূল ﷺ-এর সুন্নহতে নাই। প্রথমে দরূদ তারপর سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো মা‘বূদ নেই। তোমার নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটেই ফিরে যাব’[১০] বলা— রাসূল ﷺ-এর পদ্ধতি।

নানা কারণে প্রচলিত ছালাত আর রাসূল ﷺ-এর ছালাতের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বার ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ঘুমের দু‘আ শেখানোর সময় তিনি ‘বিনাবিয়্যিকা’-এর স্থলে ‘বিরাসূলিকা’ বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বুকে নিজের হাত দিয়ে মেরে বললেন, ‘ওয়া বিনাবিয়্যিকা’ বলো।[১১] এভাবেই নবী করীম ﷺ আমাদেরকে শব্দে শব্দে আনুগত্য শিখিয়েছেন। আর দ্বীনের মধ্যে নিকৃষ্টতম কাজ হলো নবাবিষ্কৃত কাজ এবং এই নবাবিষ্কৃত কাজই বিদআত, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।[১২] ছালাতসহ যে-কোনো

৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৫।

৭. সৌজন্যে: আলোর দিশারী যুব সংঘ, আসামপাড়া, জাফলং, সিলেট।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৪৪।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৫; মিশকাত, হা/১৭৬৪।
১০. শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন, হা/৯৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/৯৪, হা/৬২৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১১. তিরমিযী, হা/৩৩৯৪।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬৭।

ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে অবশ্যই তা বিদআতমুক্ত হতে হবে।

ছালাতের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো— এর নিয়মকানুন, আরকান-আহকাম ও দু'আর অর্থ ভালোভাবে বুঝে ছালাত আদায় এবং এর শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে নিষ্ঠার সাথে পালনই ইক্বামাতুছ ছালাত।

ছালাতে আমাদের জন্য নানাবিধ শিক্ষা রয়েছে। যেমন-

(১) স্বাস্থ্য সুরক্ষার শিক্ষা: (ক) ছালাতের আগে শরীর, কাপড় ও জায়গা পাক তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে তিনি আমাদেরকে নানা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। (খ) মিসওয়াকের মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার শিক্ষা। দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ওযূর সময় যদি কেউ নিয়মিত মিসওয়াক করে, তবে সে দাঁত ও মুখের রোগ থেকে সুরক্ষা লাভ করবে। (গ) ছালাতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে যে ব্যায়াম হয়, তার দ্বারা স্বাস্থ্য সুরক্ষার শিক্ষা পাওয়া যায়।

(২) মিতব্যয়িতার শিক্ষা: রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুদ (৬৬৫ গ্রাম) পানি দিয়ে ওযূ করতেন এবং চার মুদ (এক ছা')' থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন।[১৩] এ হাদীছে পানির অপচয় রোধে মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(৩) সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা: নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ের ছালাত আদায় মুমিনদের উপর ফরয *(আন-নিসা, ৪/১০৩)*। সময়মতো ছালাত না পড়লে ছালাত হয় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন, 'ঐসব মুছল্লীদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের ছালাতের (সময়ের) ব্যাপারে উদাসীন' *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৫)*। এই সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা শুধু ছালাতের মধ্যে নয়, ছালাতের বাইরেও সকল কাজে সচেতন থাকা ছালাতের শিক্ষা।

(৪) পোশাকে শালীনতার শিক্ষা: ছালাতের পূর্বশর্ত হলো সতর ঢাকা। এর মাধ্যমে আমাদের শালীন পোশাক তথা পর্দা অবলম্বনের শিক্ষা পাওয়া যায়। ফলে যাদের মধ্যে ছালাতের চর্চা আছে, তারা শালীন পোশাক না পরে বাসা থেকে বের হতে পারে না।

(৫) নেতার আনুগত্য শিক্ষা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'হে লোকেরা! তোমরা শোনো ও আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের উপর এমন কোনো হাবশীকে নেতা নিযুক্ত করা হয়, যে কৃষ্ণবর্ণের এবং যার মাথায় কোকড়ানো চুল আছে'।[১৪] তিনি আরও বলেছেন, 'আমি যখন রুকূ করি, তোমরাও রুকূ করো এবং আমি যখন মাথা উঠাই, তোমরাও মাথা উঠাও। আমি যখন সিজদা করি, তোমরাও সিজদা করো। আমি যেন কোনো ব্যক্তিকে আমার আগে রুকূ ও সিজদায় যেতে না দেখি'।[১৫] যে কাউকে নেতা নির্বাচন করা হোক না কেন তারই অনুগত্য করা ছালাতের অন্যতম শিক্ষা। তবে নেতার আনুগত্যের বিষয়টি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের আওতাধীন হতে হবে।

(৬) ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার শিক্ষা: নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো'। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।[১৬] অন্য হাদীছে আছে, 'তোমরা ফাঁকা বন্ধ করে মিশে দাঁড়াও'। এখানে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র এক কাতারে শামিল হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। তাতে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক কাতারে শামিল হয়।

(৭) পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা: আমাদেরকে ছালাতে পঠিত বিভিন্ন সূরা ও আয়াত হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গঠন করতে হবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে ছালাতে খুশূ-খুযূও অর্জিত হয়ে থাকে।

অতএব, ছালাতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের আলোকে সমাজের মানুষের আচরণ পরিবর্তন হলে এবং একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠলে ছালাতের শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে ছালাত প্রতিষ্ঠার এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৬২৪; ছহীহ বুখারী, হা/২০১।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০।
১৫. ইবনু মাজাহ, হা/৯৬২।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৯।

নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-মাযহারুল ইসলাম*

ফরয ছিয়াম রামাযান মাসে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর ধার্যকৃত। যা পালন করা সকল মুসলিম নর-নারীর উপর ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছিয়াম ইসলামী শরীআতের অন্যতম বুনিয়াদী শক্তি, যা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব। আর এই বিধানের ক্ষেত্রে ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দা জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। যেহেতু ফরয ইবাদত, তাই সেক্ষেত্রে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এটা স্বাভাবিক। ঠিক এই ফরয ছিয়ামের পাশাপাশি নফল তথা অতিরিক্ত ছিয়ামের বিধান ইসলামী শরীআতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ফরয ছিয়াম কিংবা ফরয ইবাদত হলো ইসলামী শরীআতে মূল ভিত্তি, যা ছাড়া ইসলাম অচল। আর নফল ছিয়াম কিংবা নফল ইবাদত হলো এই সকল ফরয ইবাদতের প্রস্তুতির রসদ। যার আদায় দ্বারা ফরয ইবাদত আদায়ে অভ্যস্থ হওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। নফল ইবাদতের উদাহরণ যদি বলা হয় একটা ফলের খোসার মতো, তাহলে খুব সম্ভব ভুল হবে না বলে মনে হয়। কারণ ফরয ইবাদত হলো একটি পরিপূর্ণ ফল সদৃশ আর নফল ইবাদত হলো ওই ফলের খোসা, যার দ্বারা ফলের নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য অর্জন হয়। বান্দার ফরয ছিয়াম হোক কিংবা নফল ছিয়াম, ইবাদতের ছওয়াব আল্লাহ তাআলা ইনছাফের সাথে প্রদান করবেন। যেহেতু ছিয়াম কেবল মহান আল্লাহর জন্য পালন করা হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিদান নিজ হাতে দিবেন বলে হাদীছে ঘোষণাও করেছেন। আল্লাহ তো চাইলে বান্দার জন্য শুধু ফরয ছিয়াম কিংবা ফরয ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধতা রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ফরযের পাশাপাশি নফলের ব্যবস্থাও রেখেছেন, যেন বান্দা ফরয ইবাদতের ত্রুটিকে নফল ইবাদতের দ্বারা পূর্ণ করতে পারে। এজন্য হাদীছে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আমাদের মহান রব জানা সত্ত্বেও বান্দার ছালাত সম্পর্কে ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, দেখো তো, সে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছে, না-কি তাতে কোনো ত্রুটি রয়েছে? অতঃপর বান্দার ছালাত পূর্ণাঙ্গ হলে পূর্ণাঙ্গই লেখা হবে। আর যদি তাতে ত্রুটি থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো তো, আমার বান্দার কোনো নফল ছালাত আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে তিনি বলবেন, আমার বান্দার ফরয ছালাতের ঘাটতি তার নফল ছালাত দ্বারা পূর্ণ করে দাও। অতঃপর সকল আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে'।[১]

যেহেতু আমাদের জীবন চলার পথ ভুলে ভরা। ভুলকে পাশ কাটিয়ে চলার মতো ক্ষমতা কিংবা ত্রুটিমুক্ত জীবন গড়ে তোলা মানবীয় গুণের বহির্ভূত এবং এটা সম্ভবও নয়, তাই বুদ্ধিমান লোকেরা ফরয ইবাদতের ঘাটতিকে নফল ইবাদতের নেকী দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সেজন্য আমাদের নফল ইবাদতের দিকে লক্ষ রাখতে হবে এবং মানবজীবনে নফল ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। বক্ষমান প্রবন্ধে 'নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো।

(১) শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম: রামাযান পরবর্তী মাস হলো শাওয়াল মাস। দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার পর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালনের ব্যাপারে রাসূল ﷺ হাদীছে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রামাযানে ছিয়াম রাখে অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রাখে, সে যেন গোটা বছর ছিয়াম রাখল'।[২]

(২) মুহাররমের ছিয়াম: মুহাররম মাসের ছিয়াম ইসলামী শরীআতে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। মুস্তাহাব হলো এই মাসে ছিয়াম পালন করা। রাসূল ﷺ বলেছেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'রামাযান মাসের ছিয়ামের পর শ্রেষ্ঠ ছিয়াম হলো মুহাররম মাসের ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পর শ্রেষ্ঠ হলো তাহাজ্জুদের ছালাত'।[৩]

খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ হলো— মুহাররম মাসের ১০ তারিখে ছিয়াম রাখা। এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ 'আশূরার দিনের ছিয়ামের দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে বিগত বছরের গুনাহ মাফের আশা রাখি'।[৪] মুস্তাহাব হলো মুহাররম মাসের ছিয়াম নয় ও দশ তারিখ অথবা দশ ও এগারো তারিখে রাখা। কেননা রাসূল ﷺ দশম তারিখে ছিয়াম পালন করেন। এবং তিনি বেঁচে থাকলে নবম তারিখে ছিয়াম থাকার আশা ব্যক্ত করে বলেন, إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ 'ইনশা-আল্লাহ (আগামী বছর) আমরা নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব'। অতঃপর রাসূল ﷺ আগামী বছর আসার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।[৫]

(৩) শা'বান মাসের ছিয়াম রাখা: শা'বান মাসের ছিয়াম খুবই

দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা; শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

১. আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; মিশকাত, হা/২০৪৭।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; মিশকাত, হা/২০৩৯।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।

www.al-itisam.com

গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রামাযান মাসের পূর্ববর্তী মাস এবং এই মাস হলো রামাযান মাসকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর প্রস্তুতিস্বরূপ ইবাদত করার অনন্য মাস। বান্দার আমল মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করার মাসই মূলত এই মাস। এজন্য এই মাসকে 'ফসল ফলানোর' মাস বললে ভুল হবে না। কেননা এই মাসের পরই বান্দার দরবারে হাযির হয় প্রত্যাশিত মহিমান্বিত মাস রামাযান। এজন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ এই শা'বান মাসে বেশি বেশি ছিয়াম রাখতেন। হাদীছে এসেছে, ছাহাবী উসামা বিন যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে শা'বান মাসে যত বেশি ছিয়াম রাখতে দেখি, তত ছিয়াম অন্য মাসে রাখতে দেখি না, তার কারণ কী? রাসূল ﷺ বললেন, 'এটা সেই মাস, যে মাসে বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয়। আর আমি আশা করি যে, আমার আমল ছিয়াম থাকাবস্থায় আল্লাহর নিকটে পেশ করা হোক'।[৬] ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ শা'বান মাসে রামাযান ব্যতীত সবচেয়ে বেশি এই মাসে ছিয়াম রাখতেন। ছাহাবীগণ বলছেন, যখন তিনি ছিয়াম ধরতেন, মনে হতো আর তিনি হয়তো ছিয়াম ছাড়বেন না। আর যখন ছিয়াম ধরতেন না, মনে হতো আর হয়তো তিনি ছিয়াম রাখা শুরু করবেন না।[৭] তাহলে উক্ত হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাসূল ﷺ শা'বান মাসে অধিক ছিয়াম রাখার অভ্যাস করতেন মাহে রামাযানকে সুন্দরভাবে ইবাদত সম্পন্ন করার জন্য।

(৪) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখা: মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন।[৮] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয়। তাই আমি ভালোবাসি আমার ছিয়াম থাকাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকটে আমার আমল পেশ করা হোক'।[৯]

সুধী পাঠক! সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম থাকাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকটে আমল পেশ করার বিষয়টি রাসূল ﷺ পছন্দ করেছেন। তিনি আমাদের উত্তম আদর্শ। তিনি আমাদেরকে তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদতের নমুনা পেশ করেছেন। এই সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়ামের দিনে আমল আল্লাহর নিকটে পেশ করার অর্থ হলো— সাপ্তাহিক দিবসের আমলনামা পেশ করা। আর শা'বান মাসে আমলনামা পেশ করার অর্থ হলো বাৎসরিক আমলনামা। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

(৫) আরাফার দিনে ছিয়াম থাকা: আরাফার দিন ছিয়াম রাখা। কেননা এই ছিয়াম থাকার বদৌলতে মহান আল্লাহ আগের ও পরের বছরের পাপ ক্ষমা করে দেন। হাদীছে এসেছে, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ 'আরাফার দিনের ছিয়ামের বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি এর দ্বারা আগের এক বছরের ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করবেন'।[১০]

(৬) মাসে তিনটি ছিয়াম রাখা: প্রতিমাসে আল্লাহর নবী ﷺ তিনটি ছিয়াম থাকার মাধ্যমে আমাদের জন্য ছিয়ামের উত্তম নমুনা পেশ করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখে, তা যেন সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান'।[১১]

চান্দ্রমাসের এই তিন ছিয়াম রাখাকে বলা হয় আইয়ামে বীযের ছিয়াম। প্রতিমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম রাখাই হলো রাসূল ﷺ-এর অনুসৃত আমল।

(৭) দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর মতো ছিয়াম রাখা: মহান আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয় আমল হলো দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর ছিয়াম। হাদীছে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয় ছালাত হলো দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর ছালাত। আর পছন্দনীয় ছিয়াম হলো দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর ছিয়াম। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ ক্বিয়াম করতেন আর একদিন ছিয়াম রাখতেন আর আরেক দিন ছিয়াম রাখতেন না'।[১২]

পরিশেষে বলতে চাই, ছিয়াম হলো মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ গোপন ইবাদত। বান্দা ও স্রষ্টার মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো ছিয়াম। রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার জন্যই খাদ্য, পানীয় ও প্রবৃত্তির চাহিদা ত্যাগ করেছে। তাই 'ছিয়াম আমার জন্য। ফলে এর প্রতিদান আমিই দিব'।[১৩]

যেহেতু ছিয়ামের নানাবিধ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিফলিত হয়, তাই ফরয ছিয়ামের পাশাপাশি নফল ছিয়াম পালন একজন মুসলিমকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও সচেতন করে গড়ে তুলে। সেই সাথে তাঁকে দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেহেতু আমাদের জীবন চলার পথে ভুলের, পাপের শেষ নেই, পাপের তুলনায় পুণ্যের পাল্লা খুবই নগণ্য, তাই একজন মুসলিমের উচিত হলো, ফরয ইবাদত আদায়ের সাথে নফল ইবাদত গুরুত্ব দিয়ে মহান আল্লাহর রেযামন্দি হাছিলের চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৬. নাসাঈ, হা/২৩৫৭, হাসান।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।
৯. তিরমিযী, হা/৭৪৭।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।
১১. তিরমিযী, হা/৭৬২, হাদীছ ছহীহ।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/১১৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪।

নারীমুক্তি আন্দোলন এবং কিছু বাস্তবতা

-মো. হাসিম আলী*

নারী সমাজদেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুরুষ যদি দেহের একটি হাত হয়, তাহলে নারী হবে অপর হাত। পুরুষ যদি দেহের একটি পা হয়, তাহলে নারী হবে অপর পা। পুরুষ যদি দেহের একটি চোখ হয়, তাহলে নারী হবে অপর চোখ। পুরুষ যদি দেহের মেরুদণ্ড হয়, তাহলে নারী হবে দেহের হৃৎপিণ্ড। পুরুষ যদি জীবনগাড়ির একটি চাকা হয়, তাহলে নারী হবে অপর চাকাটি। আর সংখ্যার বিচারে নারী হচ্ছে সমাজের অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশি। স্নেহ, মমতা, প্রেম-ভালোবাসা ও আবেগের দিক থেকে উৎকৃষ্টতম।

নারীর অবদানকে অবমূল্যায়ন, অবজ্ঞা কিংবা অস্বীকার করে কোনো জাতি কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি; ভবিষ্যতেও পারবে না। বরং নারীত্বকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমেই প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ নারীকে অবলম্বন করেই কবিরা পেয়েছেন কবিতার ভাষা, বীরেরা পেয়েছেন শৌর্য-বীর্য, ভীরুরা পেয়েছেন সাহস-শক্তি। এ নারী থেকেই শিশুরা পেয়েছে মায়া-মমতা, আদর-স্নেহের সুশীতল পরশ আর শিক্ষাদীক্ষার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কিশোর-যুবকেরা পেয়েছে নিজেকে আবিষ্কারের শক্তি, ভাবনার সীমাহীন দিগন্ত। এ নারীই পুরুষের বংশের বাতি, চারিত্রিক সনদ, প্রেরণার উৎস, জীবন সংগ্রামের সফরসঙ্গী, বেদনা-বিরহের একমাত্র সাথী, পরিবারের রাণী, প্রেম-ভালোবাসা আধার, সকল চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু এবং জান্নাত লাভের মাধ্যম। এ নারী হচ্ছেন— সুস্থ ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার, আলোকিত সমাজ, সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনের মূল কারিগর।

নারীর মাধ্যমেই পৃথিবী ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। এ নারীর স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত এবং নরম হাতের কোমল পরশে বেড়ে ওঠা সন্তানরা বিশ্বকে উপহার দিয়েছে নব নব আবিষ্কার। এ নারীর প্রেরণায় ভীরু-কাপুরুষ, আত্মভোলা ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি সন্তান পরিণত হয়েছে নরশার্দূলে। এ নারীর হাত ধরেই সভ্যতা আজ সত্য, সুন্দর আর আলোকের সন্ধান পেয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নারীরা একদিন বীরত্বগাথা রচনা করেছিলেন উহুদ, খন্দক, ইয়ারমুক, জাঙ্গে জামাল, কাদেসিয়া আর ইয়ামামার প্রান্তরে। এ নারীদের স্নেহ, ভালোবাসা, উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ত্যাগের বিনিময়েই কালজয়ী জীবনাদর্শ ইসলামের পদচুম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। তখন নারীদের জীবনব্যবস্থা ছিল ইসলাম, বর্ম ছিল কুরআন আর কর্ম ছিল সুন্নাত। এ নারী জাতি তো ইতিহাসের বিস্ময় আসিয়া, হাজেরা, সারা (আ.), খাদীজা, আয়েশা, আসমা, ফাতেমা, উম্মে সুলায়ম, সুমাইয়া, হাবীবা, খাওলা (রা.)-এর উত্তরসূরী। এ নারীরাই তো আবূ বকর, উমার, উছমান, আলী, জুবায়ের, খাব্বাব, খুবাইব, খালেদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর মতো বীর সন্তানের জন্মদাত্রী। এ নারীই তো তারেক বিন যিয়াদ, মূসা বিন নুছাইর, উমার বিন আব্দুল আযীয, ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুমুল্লাহ-এর মতো এক একটি নক্ষত্র বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। এ নারীই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুমুল্লাহ-এর মতো জগদ্বিখ্যাত ইমামদের গর্বিত মাতা।

বর্তমান যুগ প্রচারণার যুগ। মানুষের চিন্তায়, মননে, গ্রহণে-বর্জনে প্রচারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ প্রচারণায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে গলাবাজি, ধাপ্পাবাজি আর চাপাবাজি। আর বিষয়বস্তু হিসেবে সিংহভাগ জুড়ে আছে নারী, নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন। কিন্তু নারীদের প্রচারণায় শীর্ষে অবস্থানটা যতটা না ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি নেতিবাচক ফল বয়ে এনেছে। বন্ধুরূপী মুখোশধারী হায়েনারা নারীকে ছলেবলে, কলাকৌশলে ঘরের বাইরে এনে তার রূপ-রস-সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপন পণ্যে পরিণত করেছে। নারীকে ঘরের রাণী থেকে অফিসের বসের মনোরঞ্জনের সামগ্রীতে পরিণত করেছে, তাকে প্রকৃতি ও স্বাভাবিক বিকাশ থেকে বিচ্যুত করে যন্ত্রমানবে পরিণত করেছে, নারী শুধু কলুর বলদের মতো স্বীয় উপার্জিত অর্থের স্বত্ব ত্যাগের স্বাধীনতা লাভ করেছে। সে কারণে পশ্চিমাদের নগ্ন ও বস্তাপচা সংস্কৃতির সাপ্লায়ার এবং নারীকে ভালোবাসার হোলসেল এজেন্টের দাবিদার নারী মৌলোভী সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেরা সুটেড, বুটেড, কোটেড অর্থাৎ নিজে সুট, সু, কোট-টাই পড়ে ভদ্র লোকের বেশ ধারণ করলেও তাঁর সঙ্গী নারীটিকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রাখাকেই সভ্যতা বলে প্রচার করছে। এসব বন্ধুরূপী শত্রুরা নারীকে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিণী ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে প্ররোচনা দেয়, তা আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

এসব হায়েনা নিজেদেরকে নারীর স্বাধীনতা, মুক্তি, প্রগতির একমাত্র দাবিদার মনে করছে এবং তাদের বাইরের সবাইকে নারীর শত্রু বলে প্রচার করছে। এদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা হচ্ছে— নারীকে স্বামী-সন্তান-স্বজনদের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে মুক্তি দেওয়ার নামে পরিবার নামক স্বর্গের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করা, একই সাথে নারীকে পোশাকের ওজনের ঝামেলা থেকে মুক্তি দেওয়ার নামে

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

অনায়াসে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চরিতার্থ করা। এ লক্ষ্যেই তারা নারীকে 'নিজের কর্মে নিজে খাই, পোশাকের ওজন কমাই' —শ্লোগানটি রপ্ত করাতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এমন কোনো পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, যিনি নারীর শত্রু হতে পারেন। কারণ, নারীর মধ্যেই তো পুরুষেরা তাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, ফুফু, খালা, চাচি, মামি অথবা অন্য কোনো আপনজনের প্রতিচ্ছবি দেখে থাকেন। কেউ কি নিজের মা, স্ত্রী, মেয়ে, বোনের শত্রু হতে পারে? না, তা পারে না। পুরুষ যদি তার মা, স্ত্রী, মেয়ে অথবা বোনকে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখতে চায়, তবে বুঝতে হবে সেটা সে করতে চায় প্রথমত তার আপনজনের কল্যাণ চিন্তায় ও মঙ্গল কামনায়। অতঃপর তার মাধ্যমেই বৃহত্তর সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ প্রত্যাশায়। সুতরাং নারীকে কোনো কিছু দেওয়া বা না দেওয়ায় শত্রুতা বা বন্ধুত্বের প্রশ্ন ওঠে না। এতে কেবল সম্ভাব্য কল্যাণ বা অকল্যাণের প্রশ্নই জড়িত থাকতে পারে।

সে কারণে সচেতন মহলের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগছে, নারীর বন্ধু হওয়ার অর্থ কি নারীকে এমন কাজে-কর্মে উৎসাহিত করা, যাতে তার দুর্নাম হয়, কলঙ্ক রটে, স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্দশা বাড়ে? না, তাও নয়। যে বন্ধু তার অপর বন্ধুর প্রতি এরূপ আচরণ করে বা করতে চায়, সে আসলে তার বন্ধু নয়; বরং শত্রু। সে তার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উদার, দরদি ও কান্নাভেজা কণ্ঠে ইনিয়ে-বিনিয়ে যত কথাই বলুক না কেন। সুতরাং নারীর বন্ধু ও শত্রু প্রশ্নে শ্রেণি বিভক্তি সৃষ্টি করা যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে, নারী জাতি, বিশেষ করে মুসলিম নারীরা বন্ধুবেশী পশ্চিমাদের এসব এজেন্টদের খপ্পরে পড়ে গেছে। তারা তাদের সমৃদ্ধ অতীত আর সোনালি ঐতিহ্য ভুলে মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে সর্বশান্ত হচ্ছে। আজকে মুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশ নারীই কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে তথা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এ কারণে ইসলামপ্রদত্ত সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদাকে প্রত্যাখ্যান করে তার সমাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে ঘর্মক্লান্ত। নৈতিকতা বলতে যা বুঝায়, তা তাদের চরিত্রে আজ অনুপস্থিত। তাদের কাছে পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তান আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেওয়ার মতো নৈতিক উপকরণ মওজুদ নেই। তারা সারাক্ষণ ব্যস্ত 'জি বাংলা' আর 'স্টার জলসা'র মতো বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং এসবের অনুষ্ঠানাদি নিয়ে। ঘর-বর, সন্তান-স্বজন গোল্লাই গেলেও সে দিকে তাকানোর সময় তাদের নেই। তারা আধুনিকতার নামে যা কিছু আঁকড়ে ধরছে, তা নোংরামি, নষ্টামি, নগ্নতা, নিচতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু বিধি যে বাম। প্রায় এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে নারীর স্বাধীনতা, মুক্তি, ক্ষমতায়ন, উন্নতি, অগ্রগতি প্রশ্নে চলমান আন্দোলন নারীকে রীতিমতো হতাশ করেছে। এ আন্দোলনে শামিল হতে গিয়ে নারী ঘর-বর, সন্তান-স্বজন ছেড়েছে। বিসর্জন দিয়েছে নিজের সকল সুখ-শান্তি-বিশ্রাম, সম্মান ও সম্ভ্রম। কিন্তু এসবের বিনিময়ে যা অর্জন করেছে, তা হারানোর তুলনায় খুবই নগণ্য। একটি সাময়িকের জন্য পেলে অন্যটি তাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলতে হয়েছে। জীবনে ১ কোটি টাকা উপার্জন করতে গিয়ে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের স্বামী-সন্তানকে সে হারিয়েছে। বাড়ি আঙিনার সতেজ অক্সিজেন পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত আকাশের নিচে প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে গিয়ে সে হায়েনার হিংস্র ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। বস্ত্রের ওজন কমাতে যেয়ে সে বস্ত্রহীন হয়ে পড়ছে। পৃথিবীটা তাঁর জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। ঘরে-বাইরে সর্বত্র তাঁর সম্মান-সম্ভ্রম হুমকির মুখে, তাঁর জীবন আজ দুর্বিষহ। মোট মিলে এক একজন নারী এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হচ্ছে।

ভাবতে অবাক লাগে, একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার থেকে শুরু করে ডজন ডজন মন্ত্রী-এমপি নারী থাকার পরও ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তি মিলছে না। বরং নারীর ক্ষমতায়ন আন্দোলনে তারা অনেক দূর এগোলেও ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতনের মতো জঘন্য কার্যকলাপ পূর্বের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যাদের আহ্বানে, প্রলোভনে, প্ররোচনায় নারী তাঁর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে, তারা কি আজ নারীর পাশে আছে? শত বক্তৃতা-বিবৃতি, মিছিল-মিটিং, মানববন্ধন-স্মারকলিপিতে নারী কি তার হারানো সম্ভ্রম-সম্মান ফিরে পাচ্ছে? না, পাচ্ছে না।

নারীদের এ হতাশা ও ব্যর্থতার একমাত্র কারণ হলো তাদের মর্যাদা-সম্মানের উৎস ও রক্ষাকবচ ইসলামকে অবহেলা বা অস্বীকার করা এবং শান্তি, স্বাধীনতা, উন্নতি-প্রগতির নামে ভ্রান্ত ও অপর্যাপ্ত দর্শনকে সঠিক মনে করা। এমতাবস্থায় পৃথিবীর মূল চালিকা শক্তি এ নারীজাতিকে অত্যাচার, অবহেলা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে পারে একমাত্র কালজয়ী ইলাহী জীবনবিধান ইসলাম।

নারীর শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষের অপরিণামদর্শী বাড়াবাড়ি থেকে সর্তক দূরত্বে থেকে নারীর প্রতি অযথা শত্রুতা বা অন্ধ ও মায়াকান্নাপূর্ণ বন্ধুত্বের বাইরে এসে একটি আধুনিক, রুচিশীল, মার্জিত, চরিত্রবান ও অটুট নীতির অনুসারী মুসলিম সমাজে নারীর সঠিক স্থান ও ভূমিকা চিহ্নিত করা এবং নারীর সম্মান ও মর্যাদার প্রকৃত উৎসের সন্ধান দেওয়ার সাথে সাথে নারীর আধুনিক ও প্রাচীন— সকল সমস্যার সমাধানে কার্যকর, পরীক্ষিত, যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত দিক-নির্দেশনা দেওয়া সময়ের দাবি।

ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষের আফসোসের কারণ

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

মৃত্যু প্রতিটি মানুষেরই অবধারিত একটি গন্তব্য। যে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে পৃথিবীর সকল প্রাণীকেই। আর মানুষের রয়েছে মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন। যে জীবনে তাকে পৃথিবীর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। একজন মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। মৃত্যুর পর আখেরাতের ফয়সালার দিন অনেক মানুষই আফসোস করতে থাকবে। তাদের আফসোসগুলো কী হবে, তা আল্লাহ আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আজ আমরা জানার চেষ্টা করব ক্বিয়ামতের দিন কী কী কারণে মানুষ আফসোস করবে। একই সাথে আমাদেরও যাতে আফসোস করতে না হয়, সেই প্রস্তুতি সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করব, ইনশা-আল্লাহ।

আমরা পবিত্র কুরআনে ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আফসোস সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত দেখতে পাই। চলুন! আমরা তন্মধ্যে কিছু আয়াতের বিশ্লেষণ করি।

(১) শিরক করার কারণে আফসোস: শিরক করার কারণে ক্বিয়ামতের ময়দানে মানুষ আফসোস করতে থাকবে। আল্লাহ তাদের আফসোসের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে, ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ‘হায় আফসোস! আমি যদি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরীক না করতাম!’ *(আল-কাহফ, ১৮/৪২)*।

একজন মুসলিম এবং বিধর্মীর পার্থক্য হলো শিরক। একজন মুমিন তাওহীদে বিশ্বাসী হয়। অপরদিকে একজন কাফের-মুশরিক আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে শিরক করে। অনেক মুসলিম আছেন, যারা ঈমান আনার পরও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহর সাথে শিরক করেন। তারা জানেন না তাদের ঈমান, আক্বীদা, আমল শিরকযুক্ত। তাদের কথা আল্লাহ এভাবে বলেছেন, ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ‘তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এমন অবস্থায় যে, তারা সাথে সাথে শিরকও করে’ *(ইউসুফ, ১২/১০৬)*।

এই আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, অধিকাংশ মুসলিম মুখে ঈমান আনলেও তাদের কর্মের দ্বারা শিরক করে থাকে প্রতিনিয়ত। আর শিরক এমন অপরাধ, যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না, এছাড়া যে কোনো গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে’ *(আন-নিসা, ৪/৪৮)*।

সুতরাং এই শিরক করার কারণে কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও তার জন্য ক্ষমা নেই। তাই তাদের আফসোস করা ছাড়া আর কোনো গতিই থাকবে না। অতএব, আমাদের উচিত শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা, যাতে ক্বিয়ামতের মাঠে হাজারো আমল নিয়ে হাযির হওয়া সত্ত্বেও আফসোস করতে না হয়।

(২) রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ না করার জন্য আফসোস: রাসূল ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণই হচ্ছে ইসলাম। রাসূল ﷺ-ই হলেন একমাত্র আদর্শ। অথচ মুসলিম হওয়ার পরও অধিকাংশ মুসলিম জেনে বা না জেনে রাসূল ﷺ-এর আদর্শকে অবজ্ঞা করে। একই সাথে তাঁর অনুসরণ না করে অন্যদের অনুসরণ করে। যারা রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ না করে অন্যদের অনুসরণ করে, তারা ক্বিয়ামতের ময়দানে আফসোস করতে থাকবে এভাবে, ﴿يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾ ‘হায় আমাদের আফসোস! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম!’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৬৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ‘হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৭)*।

সুতরাং যারাই রাসূল ﷺ-এর আদর্শের অনুসারী না হবে, তারা কখনোই ক্বিয়ামতের মাঠে পার পাবে না। তাই তারা আফসোস করতে থাকবে কেন আমরা রাসূল ﷺ-এর অনুসারী হলাম না। আজ আমাদের উপমহাদেশে এমন হাজারো মুসলিম আছে, যারা তাদের নিজেদের আশেকে রাসূল ﷺ পরিচয় দেয়। অথচ তাদের ঈমান, আক্বীদা ও আমলে রাসূল ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ, আনুগত্য কিছুই নেই।

তারা তাদের বড় বড় পীর-আউলিয়াদের কথাকেই দ্বীন মনে করে। সুস্পষ্ট সুন্নাহর বিপরীতে বিদআতী আমল করে। রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে পিছনে ফেলে দিয়ে নিত্যনতুন আমল সৃষ্টি করে। তারা কখনোই ক্বিয়ামতের ময়দানে পার পাবে না। বরং রাসূল ﷺ নিজেই তাদের তাড়িয়ে দিবেন। রাসূল ﷺ বলেন, إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ ‘আমি তোমাদের পূর্বে হাউযের (হাউযে কাওছার) নিকটে পৌঁছে যাব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) আসবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জানো না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা কী সব নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক! দূর হোক (আল্লাহর রহমত থেকে), যারা আমার পরে (দ্বীনের) পরিবর্তন সাধন করেছে'।[১]

সুতরাং আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত সঠিক ঈমান-আমল যাচাই করে তবেই তা পালন করা। তা না হলে ভুল পথে চলার কারণে আমাদেরও হাশরের ময়দানে আফসোস করতে হবে।

(৩) বন্ধুত্বের কারণে আফসোস: ইসলামে বন্ধু এবং বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা দুনিয়ার বন্ধুই ক্বিয়ামতের মাঠে একসাথে থাকবে। তাই দুনিয়াতে ভালো বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব না করলে তাকে হাশরের মাঠে এভাবেই আফসোস করতে হবে,﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ 'হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৮)*।

অর্থাৎ দুনিয়াতে ভালো ঈমানদার, আবেদ মানুষের সাথে বন্ধুত্ব না করা এবং খারাপ, বেঈমান, মুনাফিক্ব, মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে এক শ্রেণির মানুষ এভাবেই আফসোস করতে থাকবে। অথচ সেখানে আফসোস করে কখনোই কোনো লাভ হবে না। সুতরাং ক্বিয়ামতের আগেই আমাদের উচিত হবে, ভালো ঈমানদারের সাথে বন্ধুত্ব করা। বিশেষ করে যার ঈমান, আমল, আক্বীদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ত্বরীক্বার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। যাতে তার দ্বারা দ্বীন ইসলাম শেখা ও মানা যায়।

(৪) পাপাচারী হওয়া ও আমল না করার আফসোস: ক্বিয়ামতের মাঠে ঈমানের পাশাপাশি আমল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক। শুধু মুখে বিশ্বাস ও অন্তরের ঈমান দ্বারা কাউকে বিচার করা যাবে না। তাই প্রতিটি মানুষেরই ঈমানের পাশাপাশি সৎ আমল জরুরী। যে কারণে আখেরাতে এক শ্রেণির মানুষ আফসোস করবে এভাবে, ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ 'হায়! যদি পরকালের জন্য কিছু অগ্রে পাঠাতাম' *(আল-ফজর, ৮৯/২৪)*। অন্যত্র আছে, ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ﴾ 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো' *(আল-হাক্কাহ, ৬৯/২৫)*। অন্যত্র আরও আছে, ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ 'হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম' *(আন-নাবা, ৭৮/৪০)*।

অর্থাৎ যারা পরকালের জন্য কোনো আমলই করল না, তারা আফসোস করবে। একই সাথে ভালো আমল না করা এবং খারাপ আমলের কারণে যারা পাপী হবে, তাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। তাদের আকাঙ্ক্ষা হবে, যদি আমলনামাই দেওয়া না হতো, তাহলে তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যেত। সেই সাথে তাদের এই আকাঙ্ক্ষাও থাকবে যে, যদি তারা মাটি হয়ে মিশে যেতে পারত!

কেননা হাশরের মাঠে বিভিন্ন পশু-পাখিদেরও বিচার হবে। যারা দুনিয়ায় একে অন্যের সাথে অন্যায় করেছিল। তারা তাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবে এবং তাদের উভয়কেই মাটি করে দেওয়া হবে। তাই পাপীদের আফসোস হবে যদি তারা পশু-পাখিদের মতো মাটি হয়ে যেতে পারত, তাহলে তারাও নিষ্কৃতি পেত। অথচ পাপীদের শাস্তির কোনো শেষ সীমা থাকবে না। তারা চিরজীবী হবে এবং তারা অনবরত শাস্তি পেতেই থাকবে। সুতরাং আমরা যারা নিজেদের মুমিন দাবি করি, তাদের আবশ্যিক কর্তব্য হলো পাপ ছেড়ে দিয়ে সৎ আমল করা। যাতে মৃত্যুর পর কোনো আফসোস করতে না হয়।

(৫) ঈমানদার না হওয়ার কারণে আফসোস: অনেক মুসলিমই জন্মগতভাবে মুসলিম হওয়ার কারণে ইসলাম, ঈমান, আমল, আক্বীদা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার, বুঝার কিংবা যাচাইয়ের চেষ্টা করে না। তারা গতানুগতিকভাবেই মুসলিম থেকে যায়। ফলে তাদের ঈমান, আমলে শিরক-বিদআতের সংমিশ্রণ ঘটে। যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় তাদেরই অজান্তেই। এসব মানুষসহ যারাই পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে জেনে ঈমান আনতে পারেনি, তারা মৃত্যুর পর ক্বিয়ামতের মাঠে আফসোস করবে এভাবেই, ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হতো, তবে আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' *(আল-আন'আম, ৬/২৭)*।

অর্থাৎ যারাই বিভিন্ন কারণে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে পারেনি, তারা সেদিন আফসোস করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, যদি আমাদের আবার দুনিয়ায় পাঠানো হতো, তাহলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হয়ে ফিরে আসতাম।

সুতরাং ঈমানদার হওয়া খুবই জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, যা আমরা এখনো দুনিয়ার বুকে বুঝতে পারছি না। শুধু মুসলিমের ঘরে জন্ম নিলেই ঈমানদার হওয়া যায় না। ঈমান জেনে, বুঝে বিশ্বাস এবং আমল করার বিষয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত ইসলামকে জেনে, ঈমান এনে আমল করা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, হাশরের মাঠে অধিকাংশ মানুষই বিভিন্ন কারণে আফসোস করতে থাকবে। যার মূল কারণই হলো সঠিকভাবে দলীলের ভিত্তিতে দ্বীন পালন না করা। গতানুগতিকভাবে দুনিয়াদারি করে দ্বীন-ধর্মের তোয়াক্কা না করা এবং পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে দ্বীন ইসলাম পালন করার কারণে মানুষদের হাশরের মাঠে আফসোসের শেষ থাকবে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিত দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানা, যাচাই করা এবং সঠিক ইসলাম জেনেশুনে পালন করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৯০।

নব্য জাহেলিয়্যাত

-সাঈদুর রহমান*

১. মেয়ে সন্তান হলে মনঃক্ষুণ্ন হওয়া:

জাহেলী যুগে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক উৎফুল্লতার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। আশার চেয়ে বেশি লাভ হওয়ায় রীতিমতো তার মনটা বেশ পুলকিত। বহুদিন পর ব্যবসায়ে লাভের মুখ দেখেছে। বেঁচে যাওয়া পণ্য নিয়ে প্রফুল্ল মন নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে। আজ তার চলার ভঙ্গিই ভিন্ন রকম। তার মনে যে আনন্দের স্নিগ্ধ হাওয়া দোল খাচ্ছে, তা তার চালচলন দেখেই আঁচ করা যাচ্ছে। ওই তো তার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটু বাদেই দেখা মিলবে প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে। বলবে বলে মনের মাঝে অনেক কথাই লুকিয়ে রেখেছে। অনেক দিন পর বাড়িতে যাচ্ছে। বাড়ির অদূর থেকে এক লোক গলা ছেড়ে চিৎকার করে ডাকছে, ‘ওই ভাই, ওই ভাই’। আওয়াজটা বেশ চেনাচেনা লাগছে। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত আসছে। কাছে আসতেই চিনতে আর বাকি নেই। ‘কী রে, তোর কী হয়েছে?’ ‘ভাই, খুশির সংবাদ! আপনার স্ত্রী, মানে আমাদের ভাবি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছে!’ ‘যাহ! এটা কোনো খুশির সংবাদ হলো! দিলি তো তুই আমার মুডটা নষ্ট করে!’ মুহূর্তেই তার চেহারায় মলিনতা এসে ভিড় জমায়। এখন তার চেহারা ধারণ করেছে ধূসর বর্ণের রূপ। একটা বিদ্ঘুটে চেহারা ও বিরক্তি ভরা সুর নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। স্ত্রীকে আর কী ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করবে, তার মেজাজে যে আগুন লেগেছে! বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেই বলছে, ‘এই সংবাদ শুনার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন? আমি এখন মুখ লুকাব কোথায়? সবাই আমাকে অপয়া বলবে। আমার বংশ খাঁটো হবে। আমি যদি এখন মাটির নিচে চলে যেতে পারতাম! অথবা চলে যেতে পারতাম অজানা কোনো রাজ্যে, যেখানে আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। বলবে না আমাকে কোনো কটু কথা। জাহেলী যুগে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে এভাবেই কন্যার বাবা বিলাপ করত। কুরআন মাজীদ এই চিত্রটাই এভাবে তুলে ধরেছে, ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ‘যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে বেড়ায়। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও কি তাকে রেখে দিবে, না-কি মাটিতে পুঁতে ফেলবে!? সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!’ *(আন-নাহল, ১৬/৫৮-৫৯)*।

সুধী পাঠক! এই চিত্রটাকে আপনি শুধু জাহেলী যুগের সাথে রেখে দিচ্ছেন? মনে মনে ভাবছেন জাহেলী যুগের মানুষ কত খারাপ ছিল! বিস্ময়বোধ করছেন আপনি? আপনার চোখ তো চড়কগাছ হবে, যদি আমি আঙুল উঁচিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দেই আপনার পাশের বাড়িতে জাহেলী যুগের এই কাজ হচ্ছে! আপনার চাচাতো ভাই তার স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করছে। প্রথম কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের পর পরের সন্তানও কন্যা হওয়ার কারণে আপনার চাচাতো ভাই তার স্ত্রীকে মারধর করছে। এখনো আমাদের মাঝে জাহেলী যুগের কাজ বিদ্যমান আছে। কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমরা মনঃক্ষুণ্ন হই। আত্মপীড়ায় ভুগতে থাকি। নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে অপয়া, অশুভ মনে করি। অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করি। শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে তাকে বেদম প্রহার করি। তার আত্মীয়স্বজন, বংশ নিয়ে গালিগালাজ করি। ওই সময় আপনার স্ত্রী অঝোরে লোকচক্ষুর আড়ালে অশ্রু বৃষ্টি বর্ষণ করে। ভেতরের দহন যন্ত্রণার কথা কারো কাছে বলতে পারে না। শুধু নীরবে নিভৃতে একা একা কাঁদে। অনেক অযোগ্য, মূর্খ স্বামী একধাপ এগিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। সোজাসাপ্টা তালাক দিয়ে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

শুনুন, আপনার মাঝে জাহেলী যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে। আপনাকে বলি, আপনার স্ত্রী কি নিজ থেকে কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছে? সন্তান হওয়ার পেছনে কি তার কোনো হাত আছে? তার হাতে যদি ছেলে-মেয়ে হওয়ার ক্ষমতা থাকত, তাহলে সে কি কখনো মেয়েসন্তান জন্ম দিত? সন্তান ছেলে হবে, না-কি মেয়ে এটা তো আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাআলা

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বলেন, ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ ‘আসমানসমূহ ও জমিনের মালিকানা আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা রাখেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান’ *(আশ-শূরা, ৪২/৪৯-৫০)*।

আপনার মাঝে কি একটু দ্বীনের জ্ঞান নেই? কীভাবে আপনি নির্লজ্জের মতো আপনার স্ত্রীকে মারছেন? অনেক পুরুষকে দেখেছি, দেখেছে আমার চক্ষুদ্বয় তিনটা মেয়েসন্তান হওয়ার কারণে তাকে তালাক দিয়ে আরেক নারীকে বিয়ে করেছে। আমি আবারও বলছি আপনার মাঝে জাহেলী যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে। এখনই স্ত্রীর কাছে মিনতি করে ক্ষমা চান। বলুন, আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করো। আমার উপর বিতাড়িত শয়তান জয়লাভ করেছিল। তাই আমি তোমাকে মেরেছি।

প্রিয় ভাই! আমি হলফ করে আপনাকে একটা কথা বলছি, এই কন্যাসন্তান আপনার ঘরের বরকতের কারণ হবে। আপনার রূযী-রোজগার বৃদ্ধি পাবে। আর অবশ্যই এটা হবেই। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আপনাকে অনেক টাকাপয়সা দান করবেন। কারণটা জানেন কী? নারীরা হচ্ছে দুর্বল। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের রিযিক্ব দিবেন। আপনার কি মনে আছে, বিয়ের আগে জানি আপনি মাসে কত টাকা উপার্জন করতেন? হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে। বিয়ের পর দেখুন তো আপনার এই বাড়তি টাকা কোত্থেকে আসছে? এখন আগের তুলনায় একটু বেশি উপার্জন হয়। কেন হয়, কীভাবে হয়, কার জন্য হয়, কোনোদিন কি একটু চিন্তা করেছেন? মধ্যরাতে কি ভেবেছেন, কীভাবে এখন বেশি টাকা উপার্জন হয়? আগে তো এত পরিশ্রম খাটুনি করেও এত টাকা উপার্জন করতে পারতাম না! আপনার স্ত্রী যখন তার বাবার কাছে ছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তার রিযিক্বটা তার বাবার মাধ্যম দিয়েছেন। এখন সে আপনার স্ত্রী, তাই আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে তার রিযিক্ব দিচ্ছেন। সেজন্যই এখন আপনি বেশি টাকা উপার্জন করতে পারেন। আপনার কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তার রিযিক্ব আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে দিবেন। তাই রিযিক্ব নিয়ে কখনো দুঃশ্চিন্তায় থাকবেন না।

একটা কথা মনের মাঝে গেঁথে রাখুন। নবী-রাসূলগণ আলাইহিস সালাম হচ্ছেন কন্যার বাবা। আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারজন কন্যাসন্তান ছিল। আপনি কি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ভালো মানুষ? তাঁর যদি কন্যাসন্তান হয়, তাহলে আপনার হলে সমস্যা কী? নবী-রাসূলদের আলাইহিস সালাম মতো আপনিও কন্যাসন্তানের বাবা। এটা কি ভালো লাগার নয়?! কখনো চিন্তা করবেন না। দেখুন, আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কত বড় বড় উপহার দিচ্ছেন, مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘কারো তিনটি কন্যাসন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে’।[১] অপর আরেকটি হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ ‘কোনো ব্যক্তির দুটি কন্যাসন্তান থাকলে এবং তারা যতদিন তার সাথে থাকে, ততদিন সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে, তবে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে’।[২]

আরেকটি কথা বলি, বলুন তো সবার যদি শুধু ছেলেসন্তান হয়, তাহলে এই ছেলেরা বিয়ে করবে কাদের? মেয়ে পাবে কোথায়? এজন্যই আল্লাহর সৃষ্টি বড়ই নিখুঁত। তিনি কাউকে ছেলে আবার কাউকে মেয়ে আবার কাউকে দুটিই দান করেন।

আপনাকে আমি একটা ভরসার বাণী শুনাচ্ছি। আপনার চারজন কন্যাসন্তান আছে? কোনো টেনশন নেই। আপনি অন্তত নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে না, লুটোপুটি খেতে হবে না বৃদ্ধ বয়সে মলমূত্রের সাথে। আপনার অসুখবিসুখ হলে এই কলিজার টুকরোরা দুর্বার গতিতে আপনার কাছে ছুটে আসবে। আপনার ক্ষীণকায় দেহের যত্ন নিবে, ময়লা কাপড় ধুয়ে দিবে,

১. ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৬৯, হাদীছ ছহীহ।
২. ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৭০, হাসান।

অপরিচ্ছন্ন অপরিপাটি ঘরদোর পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে দিবে। ছয় ছেলের বাবা-মা দেখবেন বৃদ্ধাশ্রমে আছে। কিন্তু ছয় মেয়ের বাবা-মা বৃদ্ধাশ্রমে নেই। একজন না একজন আপনাকে ঠাঁই দিবেই। নয় কন্যাসন্তানের মাকে দেখেছি আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে নাতিপুতি নিয়ে খুব ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছেন। আবার এও দেখেছি চার ছেলের মা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে চলছে। তাই আপনাকে বলছি, আপনি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করায় মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। এটা জাহেলী যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্য। আপনার মাঝে যেন এই বৈশিষ্ট্য না থাকে।

অনেক বাবা তো কন্যাসন্তানকে রাগ করে লেখাপড়াই করান না। বলেন, মেয়ে মানুষ এত লেখাপড়া করে কী হবে! যতই লেখাপড়া করুক, দিনশেষে পাতিল মাস্টার। মানেটা মনে হয় আপনি বুঝেননি। যত শিক্ষিত নারীই হোক তাকে কিন্তু রান্নাবান্না করতে হয় এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন তিনি। ছেলেকে স্কুলে পড়ান, বিকেলে বাড়িতে শিক্ষক রেখে আলাদাভাবে পড়ান, তার জন্য আলাদা যত্ন, কিন্তু মেয়ের বেলায় একেবারে অনীহা প্রকাশ করেন।

আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন! প্রিয় ভাই! আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি যদি ছহীহ বুখারীর জগদ্বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' পড়েন, তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাবে প্রায় জায়গায় একটা বর্ণনা এভাবে নিয়ে এসেছেন, 'কারীমার বর্ণনা অনুযায়ী এমন'। এর মানে হচ্ছে কয়েকজন মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবের পাণ্ডুলিপি লিখেছেন। তাদের মাঝে একজন হচ্ছেন কারীমা। তিনিও পাণ্ডুলিপি লিখেছেন। তার পাণ্ডুলিপিতে বর্ণনাটা এভাবে এসেছে। সুবহানাল্লাহ! একজন মেয়ে মানুষ মুহাদ্দিছা! আপনি কি কল্পনা করতে পারেন? একজন মেয়ে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করলে মুহাদ্দিছা হতে পারেন! আমি প্রায়ই কারীমা নাম্মী এই মুহাদ্দিছা মেয়েকে নিয়ে ঈর্ষা করি। ইশ! আমি যদি তার মতো হতে পারতাম! হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ-এর মতো এত বড় একজন বিদ্বান কত সম্মানের সাথে তার নাম উল্লেখ করতেন। আহ! আমার মেয়ে যদি এমন হতো! আপনার কি মন চায় না আপনার মেয়ে এমন হোক? আমার তো খুব মন চায়, আল্লাহ! আমার মেয়ে যদি এমন হতো! আপনার মেয়ে হয়েছে এজন্য তাকে অবহেলা করে রেখে দিয়েন না। তাকে পড়ালেখা করান। সেও যোগ্য হবে ইনশা-আল্লাহ। আমার মেয়েটা কারীমার মতো জগদ্বিখ্যাত বিদুষী হবে! আমার মেয়ে মানুষের অন্তরের চিকিৎসা করবে! আজ নারীদের মাঝে মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, মুফতী নেই বললেই চলে! কিন্তু অসংখ্য ডাক্তার আছে! আপনি আপনার মেয়েকে মুহাদ্দিছ বা মুফাসসির অথবা মুফতী বানান! নারীদের গোপন অনেক মাসআলা তারা চোখলজ্জায় অনেক সময় আলেমদের কাছে বলতে পারে না। আপনার মেয়েকে মুফতী বানান। বাড়িতে বসে বসে আপনার মেয়ে নারীদের মাসআলাগুলোর সমাধান দিবে! শুনুন, আমাদের মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লা-হু আনহা কিন্তু নারী ছিলেন! তিনি কিন্তু অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সময়ে বড় বড় ছাহাবী, তাবেঈ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের কাছে ওই বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে সরাসরি চলে যেতেন আম্মাজান আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে। তিনি সুন্দর করে দলীলের আলোকে বুঝিয়ে দিতেন। আপনি আপনার মেয়েকে নারীদের জন্য একটা আদর্শ রেখে যান। প্রিয় পাঠক! মেয়ে দেখে আপনার কলিজার টুকরোকে অবহেলা করবেন না। নাক সিটকাবেন না। তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলুন। জাহেলী যুগের মানুষের মতো আপনি আচরণ করবেন না। আল্লাহ তাআলা আপনার সহায় হোন- আমীন!

২. মেয়েসন্তান জীবন্ত প্রোথিত করা:

জাহেলী যুগে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। এই আলোচনাটা শুরু করার আগে কে সর্বপ্রথম জাহেলী যুগে কন্যাসন্তান জীবন্ত প্রোথিত করে ও কীভাবে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো এই ইতিহাস জানা সমীচীন মনে করছি।

জীবন্ত কন্যাসন্তান সর্বপ্রথম প্রোথিত করে ক্বায়েস ইবনু আছেম আত-তামীমী। এর কারণ হলো নু'মান ইবনে মুনযির একবার বানূ তামীম গোত্রের উপর হামলা করে, তাদের অনেক নারী ও শিশুদের বন্দী করে নেয়। তারপর তার কাছে বন্দীদের চাওয়া হলে তিনি নারীদের ঐচ্ছিকতা প্রদান করে স্বামী, বাবা বা বন্দিকারী— যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবে। অধিকাংশ নারী তাদের বাবা ও স্বামীকে গ্রহণ

করলেও ক্বায়েসের স্ত্রী বন্দিকারীকে গ্রহণ করে। এতে ক্বায়েস যারপরনাই ক্রোধান্বিত হয়ে শপথ করে, ‘এরপর থেকে তার যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে সে জীবন্ত প্রোথিত করবে’। তারপর থেকেই তামীম গোত্রের মাঝে এই রীতি ব্যাপকতা লাভ করে। সাসায়া ইবনু নাজিয়াহ আত-তামীমী সে ছিল আবার ক্বায়েসের সম্পূর্ণ উল্টো। সে মুক্তিপণ দিয়ে মেয়েদের রক্ষা করত। সে যদি শুনতে পেত কোথাও মেয়েসন্তান জীবন্ত প্রোথিত করা হবে, সে হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে ওই লোককে বলত, তুমি তাকে জীবন্ত প্রোথিত করো না। তার বিনিময়ে আমি তোমাকে এত দিরহাম দিব। তারপর চুক্তি অনুযায়ী দিরহাম দিয়ে সে এভাবে মেয়েদের রক্ষা করত। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদুজই ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য পেয়ে ধন্য হন। আল-হামদুলিল্লাহ।

জাহেলী যুগে মেয়েদের দুভাবে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো।

(ক) সন্তান প্রসবের পূর্বে স্বামী বলত, এই যে, কূপের সন্নিকটে সন্তান প্রসব করবে। মেয়ে হলে আর কথা নেই। সাথে সাথে কূপে ফেলে দিবে। আর ছেলে হলে সযত্নে নিয়ে আসবে।

(খ) স্বামী বলা নেই কওয়া নেই, একদিন হুট করে স্ত্রীকে এসে বলত। এই শুনছ, তোমার মেয়েকে দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে দাও! তাকে নিয়ে যে আমি নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাব। আমার মেয়ে বলে কথা। অপরিচ্ছন্ন থাকলে কি হয়! তারপর স্ত্রী মেয়েকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিত। মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে গভীর কূপের সন্নিকটে দাঁড় করাতো। তারপর বলত, মা! নিচের দিকে তাকাও তো। আর অমনি পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। একবারের জন্যও পেছনে তাকাত না। আহ! আহ![৩]

জাহেলী যুগের মানুষ কন্যাসন্তান জীবন্ত প্রোথিত করত। তারা কত পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী ছিল, তাই না? আমার আপনার যুগের মানুষ জাহেলী যুগের মানুষের চেয়ে কম পাষাণ নয়। বরং তারাও তাদের মতো। আমার আপনার যুগের মানুষ শুনতে পেয়েছে হাসপাতালে তার কন্যাসন্তান হয়েছে। রাতের অন্ধকারে, প্রকৃতিতে যখন আঁধার ছেয়ে গেছে তখন মৃদু পায়ে হেঁটে আলগোছে পলিথিনের ভেতরে মুড়িয়ে বাচ্চাকে ডাস্টবিনে ফেলে এসেছে। পরে রাস্তার কুকুর যখন ওই শিশুকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে তখন মানুষ টের পেয়েছে। বিষয়টা কি আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে? আমরা কোনো আজগুবি কথা বলছি না। আপনি পেপার-পত্রিকার পাতায় চোখ রাখুন, তাহলে দেখতে পাবেন।

সাত মাস হয়েছে। এরপর আল্ট্রাসনোগ্রাফি করার পর জানা গেছে মেয়ে বাচ্চা হবে। পেটের ভেতর রেখেই এই শিশুকে মেরে ফেলেছে। প্রিয় ভাই! এই শিশু যদি পরকালে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করেছেন, আপনি কি তার উত্তর দিতে পারবেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ ‘সেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাশিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে’ *(আত-তাকভীর, ৮১/৮-৯)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী করা, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা, কারো প্রাপ্য না দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেওয়া আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং মাল বিনষ্ট করা’।[৪]

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ঔষধ খেয়ে কত সন্তান যে বর্তমানে নষ্ট হচ্ছে তা আল্লাহ মা‘লূম। এর সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। অনেক মানুষ দরিদ্রতার ভয়ে অথবা জায়গা-জমিন স্বল্প থাকার দরুন গর্ভেই সন্তান হত্যা করে! তারা কাবীরা গুনাহ করছে। এটা যে কত জঘন্য পাপ তারা যদি জানত! মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না। আমরা তাদের ও তোমাদের জীবিকা দিব। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩১)*।

৩. ফাতহুল বারী, হা/৫৯৭৫, ১৩/৪২১-৪২২।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৪০৮।

www.al-itisam.com

আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে, সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেকটা সৃষ্টিজীবকে জীবিকা দান করেন। আমাদের কি তিনি দেবেন না?

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ‘পৃথিবীর বুকে যত প্রাণী আছে, সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত’ *(হূদ, ১১/৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ কত প্রাণী আছে তাদের জীবিকা বহন (জমা) করে না। আল্লাহ তাদের ও তোমাদের জীবিকা দিয়ে থাকেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সবকিছু জানেন’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬০)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ‘তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হতে, তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক্ব দেওয়া হয়, সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক্ব দেওয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে’।[৫]

এই পৃথিবীতে আপনার যেমন বাঁচার অধিকার আছে, ওই শিশুটারও বাঁচার অধিকার আছে। আপনি কেন বলপ্রয়োগ করে তাকে হত্যা করছেন? এই মুখ নিয়ে কি আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে পারবেন? আমি আপনি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম, তখনই আমরা পৃথিবীতে কতটুকু রিযিক্ব পাব তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। সেখানে যে পরিমাণ লেখা আছে, তার চেয়ে বিন্দু পরিমাণ কমও পাবেন না আবার বেশিও পাবেন না। নবী ﷺ বলেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا.

‘তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে ৪০ দিন পর্যন্ত (শুক্র হিসেবে) জমা থাকে। তারপর ওই রকম ৪০ দিন রক্তপিণ্ড, তারপর ওই রকম ৪০ দিন গোশতপিণ্ডাকারে থাকে। তারপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাকে রিযিক্ব, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য— এ চারটি বিষয় লেখার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত বা এক গজের তফাত থাকে। এমন সময় তাক্বদীর তার ওপর প্রাধান্য লাভ করে আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত বা দুহাত তফাত থাকে। এমন সময় তাক্বদীর তার উপর প্রাধান্য লাভ করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে’।[৬]

একটা লোক তিন দিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। বিছানায় তার নিথর দেহটা পড়ে ছিল। তিন দিন পর দ্বিপহরের সময় হঠাৎ লোকটা বিছানা থেকে উঠে পড়ে। তারপর বাহিরে গিয়ে তিন চক্কর পায়চারি করে ঘরে প্রবেশ করে। টেবিলের উপর রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি পান করে ধপাস করে বিছানায় পড়ে যায়। আর ওই মুহূর্তে সাথে সাথে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা থেকে আপনি কী বুঝতে পারলেন? মানে এখনো তার পৃথিবীতে তিন চক্কর পায়চারির বাকি ছিল ও এক গ্লাস পানি পান করার বাকি ছিল। তার এক গ্লাস পানি রিযিক্ব বাকি ছিল বিধায় তার মৃত্যু হয়নি। আপনার জন্য যে রিযিক্ব বরাদ্দ আছে তা না খেয়ে আপনারও মৃত্যু হবে না।

এক প্রতিবন্ধীকে দেখেছি তিন তলা বিল্ডিংয়ের মালিক। আশ্চর্যের বিষয়! সে কীভাবে তিন তলার মালিক হলো! তার ভাগ্যে তার রিযিক্বে আছে তাই সে এর মালিক হয়েছে। তাই রিযিক্ব নিয়ে কখনো টেনশন করবেন না। আপনি কি শয়তানের কাছে পরাভূত হবেন? তাহলে কোনো অবস্থাতেই রিযিক্বের চিন্তায় জাহেলী যুগের মানুষের ন্যায় কন্যাসন্তান হত্যা করবেন না। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৫. তিরমিযী, হা/২৩৪৪, হাদীছ ছহীহ।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৩২।

www.al-itisam.com

কল্যাণ লাভের গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপদেশ

*[১৩ শা'বান, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আহমাদ বিন তালেব বিন হামীদ** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমরা কেবল তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নফসের খারাবি ও আমলের মন্দ দিক থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও মহান নেতা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী ও তাঁর অনুসারীদের উপর ছালাত ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মরো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে যাচঞা করো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী' *(আন-নিসা, ৪/১)*।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দিবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল' *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)*।

অতঃপর, নিশ্চয়ই চিরসত্য কালাম হলো আল্লাহর কালাম। আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মাদ ﷺ প্রদত্ত হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো দ্বীনের মধ্যে বিদআতের প্রচলন করা। আর প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

হে মুমিনগণ! আপনারা জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় চারটি জিনিস বান্দার জন্য অধিক উপকারী। সেগুলো হলো— (১) তাওহীদের স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের সাথে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে দূরে থাকা। (২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বিনয়ী হওয়া এবং তাঁর কাছে নিজেকে মুখাপেক্ষী করা। (৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি সুধারণা রাখা। (৪) একমাত্র তাঁর কাছেই তওবা করা, যদিও বান্দা দিনে ৭০ বার পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে; তবুও তার কাছেই ক্ষমার জন্য প্রত্যাবর্তন করবে।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ হলো তাঁর জগৎ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিষয়ে ইহকালের প্রশান্তি, পরকালে মহাঅনুগ্রহ অর্জন এবং তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে শরীক স্থাপন থেকে বেঁচে থাকা। বান্দা কীভাবে আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, যে বিষয়ে তাঁর সাথে বান্দার কোনো শরীকানা নেই। বরং বান্দা নিজেকে তাঁর রাজ্যে রেখে কল্পনা করলে দেখবে যে, সে তাঁর বিশাল রাজত্বের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এবং এর বিশাল সৃষ্টির মাঝে সে অতি নগণ্য একজন। তিনি বান্দাকে পরিচালনা করেন যেভাবে তিনি সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করেন। কাজেই বান্দা কোনোভাবেই দাসত্ব থেকে বের হয়ে প্রভুত্বের গুণ দাবি করতে পারে না। কেননা জগৎ নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচনের ক্ষমতার দাবি করা অন্তরের কাবীরা গুনাহের শামিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ 'আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন, এতে ওদের কোনো হাত নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে!' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৬৮)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বিনয়ী হওয়া এবং তাঁর কাছে নিজেকে মুখাপেক্ষী করার অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত নাযিল হওয়া, বিপদাপদ দূরীকরণ, তাঁর অনুগ্রহের পোশাকে নিজেকে আবৃতকরণ এবং বালা-মুছীবত থেকে সুরক্ষা লাভ করা। এর প্রতিদানস্বরূপ উত্তম অভিভাবক মহান আল্লাহ বান্দার উপর থেকে ক্ষতি প্রতিরোধ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দানের দায়িত্ব নেন। এটাই শ্রেষ্ঠ দ্বার ও সরল পথ। কুফরী অবস্থাতেও তাঁর কাছে কেউ বিনয়ী ও মুখাপেক্ষী হলে যেখানে সুফল পায়, সেখানে ঈমানের সাথে এটা করলে ব্যক্তি সুফল পাবে না এটা কি হতে পারে?! আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যখন তোমাদেরকে সমুদ্রে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তিনি ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলে আনেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও। আর মানুষ তো খুব অকৃতজ্ঞ' *(আল-ইসরা, ১৭/৬৭)*। আর এটাই একমাত্র দরজা, যা আল্লাহ তাঁর নিজের ও বান্দাদের মাঝে স্থির করেছেন। যে তাঁর অভিমুখী হয় তার উপর অনুগ্রহের ধারা বর্ষিত হয়, তাঁর দরজায় যে দণ্ডায়মান হয় তার উপর ধারাবাহিকভাবে নেয়ামতরাজি আগমন করে এবং যে সেই দরজা দিয়ে তাঁর নিকট প্রবেশ করে সে প্রকৃত অনুগ্রহ লাভ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ 'সুতরাং যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হলো, তখন তারা কেন বিনীত হলো না? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল' *(আল-আনআম, ৬/৪৩)*।

আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখার অর্থ হলো, যাকে আল্লাহ তাআলা এটা দান করেছেন সে কতই না সৌভাগ্যবান! যে ব্যক্তি এটা লাভ করেছে সে কল্যাণের কোনো কিছুই হারায়নি। আর যে ব্যক্তি এটা হারিয়েছে সে কল্যাণের কোনো কিছুই পায়নি। আপনি সুধারণার চেয়ে নিজের জন্য অধিক উপকারী ও গ্রহণযোগ্য কোনো ওযর-ই আল্লাহর নিকট পাবেন না। আপনি এটার চেয়ে আল্লাহর দিকে অধিক পথ প্রদর্শনকারী ও দিক-নির্দেশনা দানকারী অন্য কোনো বিষয় পাবেন না। এটা আপনাকে আল্লাহ সম্পর্কে সে শিক্ষাই দিবে, যা তিনি আপনার সাথে করতে চান। এটি এমন সুসংবাদ দিবে, যা চোখ কখনো অবলোকন করেনি এবং ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর মধ্যে হাদীছে কুদসীতে এর বর্ণনা এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সেইরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে'।[১]

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০৫।

بارَك اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه من الآياتِ والذِّكْرِ الحكيمِ، ونَفَعَنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم...

দ্বিতীয় খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান। আমি আমার রবের দেওয়া প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং আমি তাঁর পরিপূর্ণ গুণকীর্তন করছি যেভাবে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি মুত্তাক্বীদের অভিভাবক। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং ছবরকারীদের ইমাম। হে আল্লাহ! আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল ছাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো' *(আত-তাওবা, ৯/১১৯)*।

আপনারা জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে বারবার তওবা করা সকল পদমর্যাদা ও সম্মান লাভের মূল। যে এটা হারায় তার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই আর যে তা পায় তার হারানোর কিছু নেই। এটা দৃশ্যমান ও গোপন সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি, মর্যাদার উৎস এবং বেলায়েত অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা তওবা না করাকে যুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ 'আর যারা তওবা করে না, তারাই তো যালেম' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১১)*। তওবা করা নবী-রাসূল, ছিদ্দীক-ওলী, সৎকর্মশীল-তাক্বওয়াবান, পথভ্রষ্ট পাপাচারী এবং দুর্ভাগা কাফের সকলের জন্যই জরুরী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো' *(আন-নিসা, ৪/১)*। অতএব, তওবা করা ও অনুতপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি তাক্বওয়া অবলম্বন করুন। অসৎকর্মশীলদের তওবা অসৎকর্ম পরিত্যাগের মাধ্যমে হবে আর সৎকর্মশীলদের তওবা সৎকর্ম চালু রাখার মাধ্যমে হবে। তওবা নিয়মিতভাবে হোক অথবা অনিয়মিতভাবে হোক উভয়টি চালু রাখাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

মোটকথা হলো, যাকে অল্প কিছু উপকৃত করে না, তাকে বেশি কিছুও উপকৃত করে না। আর যে ইশারায় উপকৃত হতে পারে না, সে স্পষ্ট বাক্য ব্যবহারেও উপকৃত হয় না। যদি আল্লাহ আপনাকে বুঝ দান করেন, তাহলে আপনার শোনা বন্ধ হবে না এবং উপকৃত হতেও সময় লাগবে না।

তোমরা রেখো গো স্মরণ, একদিন হবে যে মরণ!

*-জাবির হোসেন**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[চ]

বন্ধু আমার! যখন দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে, তখন দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিমেষেই শেষ হয়ে যাবে। যে দুনিয়ার জন্য আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন থেকেছি, সেই দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক এক পলকেই শেষ। কারো সাথে কোনো যোগাযোগ করতে পারব না। কারোর কোনো খবরও জানতে পারব না। আমার বাড়ি, গাড়ি, জমি, জায়গা সবই ব্যবহৃত হবে। আমার মৃত্যুতে দুনিয়া এক সেকেন্ডের জন্য থমকে দাঁড়াবে না।

—কিন্তু আমি?

—আমি তো এখন শুধু লাশ। কেউ আর আমার নাম ধরে ডাকে না।

আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কবরে রেখে আসতে পারলেই, তাদের ঘাড় থেকে বোঝা নেমে যায়। তারা ভার মুক্ত হয়। আমাকে কবর দিয়ে তারা চলে যায়— যে যার কাজে। দু-একদিন মনে রাখে আমাকে।

—তারপর।

তারপর একে একে সবাই ভুলে যায় আমাকে। এটাই বাস্তবতা। এটাই নিয়ম।

কবরের জীবনে আমি সম্পূর্ণ একা। কাছে নেই পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়স্বজন। নেই কোনো বন্ধুবান্ধব, নেই কোনো সান্ত্বনাদাতা, নেই কোনো পরামর্শদাতা। আমি এ কোন জগতে এলাম। কোন জীবনে এলাম। আলো-বাতাসশূন্য মাটির ঘর, মাটির বিছানা। এ তো সেই জীবন, যে জীবনকে আমি উপেক্ষা করেছি। যে জীবন নিয়ে বছরে ৫২ দিন আলোচনা শুনেছি। জালসা-জৌলুসে, মোবাইলে কত বক্তব্য শুনেছি— তার হিসাব নেই। ওলামায়ে কেরামের কবর বিষয়ক বক্তব্যগুলোকে কী কোনোদিন থোড়ায় কেয়ার করেছি?

এখন এজীবনের বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু হায়! এখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো উপায় আমার নেই। হায়! এখান থেকে পালাবার কোনো সুযোগ নেই আমার। এখন আমার কাছে দুই জন ফেরেশতা আসবেন এবং আমাকে উঠিয়ে বসাবেন। তারপর তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার রব কে?' আমি যদি মুমিন হই, তার উত্তরে বলব, 'আমার রব আল্লাহ'। অতঃপর জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার দ্বীন কী?' তখন আমি বলব, 'আমার দ্বীন হলো ইসলাম'। এরপর তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' আমি বলব, 'তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল'। পুনরায় তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কী করে জানতে পারলে?' তখন বলব, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি'।

তখন আসমানের দিক থেকে শব্দ আসবে, 'আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এছাড়া তাঁর জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও'। তখন আমার প্রতি জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জান্নাতের খোশবু আসতে থাকবে এবং আমার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।

অতঃপর আমার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসবে এবং আমাকে বলবে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল'। আমি বলব, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মতো চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে'। তখন সে বলবে, 'আমি তোমার নেক আমল, যা তুমি দুনিয়াতে করতে'। আমি বলব, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি ক্বিয়ামত ক্বায়েম করো। যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি'।

অপরপক্ষে আমি যদি অবিশ্বাসী হই, যখন আমার রূহ দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন আমার নিকট দুই জন ফেরেশতা আসবেন এবং আমাকে উঠিয়ে বসাবেন। অতঃপর তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার রব কে?' আমি বলব, 'হায়! হায়! আমি তো জানি না'। অতঃপর জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার দ্বীন কী?' আমি বলব, 'হায়! হায়! আমি তো জানি না'। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' আমি বলব, 'হায়! হায়! আমি তাও তো জানি না'।

এ সময় আকাশের দিক হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও'।

আমার দিকে জাহান্নামের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকবে এবং আমার কবর এত সঙ্কুচিত হবে, যাতে আমার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপরদিকে ঢুকে যায়। এ সময় আমার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসবে এবং বলবে, 'তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ করো। এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হতো'। আমি

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

জিজ্ঞেস করব, ‘তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে’। সে বলবে, ‘আমি তোমার সেই বদ আমল যা তুমি দুনিয়াতে করতে’। আমি বলব, ‘আল্লাহ ক্বিয়ামত ক্বায়েম করো না’।[১]

আমার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হবে। যাঁর সাথে থাকবে একটি লোহার হাতুড়ি। যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে সেই পাহাড়ও ধুলোয় পরিণত হয়ে যাবে। সেই ফেরেশতা এই হাতুড়ি দ্বারা আমাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করবে। আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করব, যে মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবকিছুই শুনতে পাবে। এভাবেই শাস্তি চলবে।[২]

[ছ]

হায়রে কবরের জীবন! এই জীবনে আমাদেরকে পদার্পণ করতে হবে জেনেও আমরা উদাসীন। অথচ আমাদের পূর্বসূরিরা এই কবরকে দেখে কতই না ভয় করতেন। কতই না ক্রন্দন করতেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ‘আমি কবরের চেয়ে কঠিনতম স্থান আর কোথাও দেখিনি’।[৩]

তাইতো রাসূল ﷺ প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দু‘আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবন ও মরণের ফেতনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জাল-এর ফেতনা হতে’।[৪]

উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কোনো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করা হলে তো আপনি এভাবে কাঁদেন না, অথচ এই কবর দর্শনে এত বেশি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আখেরাতের মনযিলসমূহের (প্রাসাদ) মধ্যে কবর হলো প্রথম মনযিল। এখান হতে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর সে এখান হতে মুক্তি না পেলে তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো বেশি কঠিন হবে’।[৫]

বন্ধু আমার! সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ ‘মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/১)*।

এই জীবন একবারই, এই সময়টুকু কাজে লাগাতে হবে সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে। মৃত্যুর পর আর কোনো ইবাদত করতে পারব না। সে সুযোগও নেই। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়। দু’টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবারের সদস্য, সম্পদ ও তার আমল। তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ ফিরে আসে। আর আমল তার সাথে থেকে যায়’।[৬]

যদি বেপরোয়া জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে পরকালে অসৎকর্মশীলদের ভয়াবহ শাস্তি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আবেদন করতে থাকব। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘এমনকি যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দাও। যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আমি করিনি। কক্ষনো না, এটা তো তার একটা কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৯৯-১০০)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সেদিন সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন যেদিন তাদের শাস্তি আসবে, যখন সীমালঙ্ঘনকারীরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রসূলদের অনুসরণ করব। (তখন তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোনো পতন নেই?’ *(ইবরাহীম, ১৪/৪৪)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে যে রূযী দিয়েছি, তোমরা তা হতে ব্যয় করো, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে (অন্যথা মৃত্যু আসলে সে বলবে,) ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি ছাদাক্বা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম’ *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/১০)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের করো, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এত আয়ু দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো, সীমালঙ্ঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই’ *(ফাত্বির, ৩৫/৩৭)*।

কিন্তু বন্ধু, একবার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে দুনিয়াতে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং মরণকে স্মরণ করে বুদ্ধিমানের পরিচয় প্রদানেই আছে সফলতা।

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৫৩৪, সনদ ছহীহ।
২. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৫৩, হাদীছ ছহীহ।
৩. তিরমিযী, হা/২৩০৮, হাসান।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৭৭।
৫. তিরমিযী, হা/২৩০৮, হাসান।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬০।

অহংকার : কারণ ও প্রতিকার

*-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ**

অহংকারকে আরবীতে বলা হয় الْكِبْر। যার অর্থ বড়ত্ব প্রদর্শন করা, অন্যের চাইতে নিজেকে বড় মনে করা। পারিভাষিক অর্থে সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হীন মনে করাকে অহংকার বলা হয়। রাসূল ﷺ বললেন, الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ 'প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা'।[১]

অহংকার মানব স্বভাবের এক নিম্ন, নিকৃষ্ট চিহ্ন বা নিদর্শন। এটা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গেঁয়ো-শহুরে, বর্ণ-ধর্ম বিচার করে না, বরং এর প্রভাব সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে চিরাচরিতভাবে বিরাজমান। অহংকার মানব আত্মার এক কঠিন ব্যাধি, যা ব্যক্তিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসূল ﷺ তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে মানুষকে সাবধান করেছেন। তার তৃতীয়টি হলো আত্ম-অহংকারী হওয়া। তিনি বলেন, وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ 'আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে খারাপ'।[২]

অহংকার মানব জীবনের জন্য বিধ্বংসী এজন্য যে, অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে। এজন্যই শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে আর মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বের সাথে অন্যেরও করে'।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এ-ও কি অহংকার? রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা'।[৪]

* শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১।
২. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৮০২; মিশকাত, হা/৫১২২।
৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.), ২/৩১৬।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১।

আসলে যে ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হয়, সে নিজেকে নিজেই ধ্বংস করে ফেলে। এমনকি ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ধ্বংস করার ব্যাপারে এক নিদারুণ ভূমিকা পালন করে।

অহংকারের কারণ :

অহংকারের বেশ কতগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির আধিক্যতা : ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক নেয়ামত ও পরীক্ষাও বটে। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ এর দ্বারা ফেতনায় পতিত হয়, হয়ে পড়ে অহংকারী, বেড়ে যায় উদাসীনতা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/৯)*।

অত্যধিক সম্পদের মালিক ছিল কারূন। যার কারণে সে অহংকারী হয়ে পড়েছিল। ভুলে গিয়েছিল নিজের আসল পরিচয়। সত্য থেকে বিমুখ হয়ে জিদ করে বসেছিল মিথ্যার উপর। যার কারণে আল্লাহ তাকে সহ তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ 'কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। বস্তুত সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৬)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ 'সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? কিন্তু অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয় না' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾ 'অতঃপর আমি

www.al-itisam.com

কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৮১)*।

ইলম বা বিদ্যা : অহংকারের যত কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে ইলমের অহংকার একধাপ এগিয়ে। হাফেয যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অহংকারের সবচেয়ে নিম্ন, নিকৃষ্ট প্রকার হলো ইলমের অহংকার। কেননা তার ইলম তার কোনো কাজে আসে না। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, জ্ঞান তার অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। সে নিজেকে হীন মনে করে এবং সর্বদা নিজের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। একটু উদাসীন হলে ভাবে, এই বুঝি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলাম ও ধ্বংস হয়ে গেলাম। আর যে ব্যক্তি ইলম শিখে গর্ব করার জন্য ও নেতৃত্ব লাভের জন্য, সে অন্যের উপর অহংকার করে ও তাদেরকে হীন মনে করে। আর এটিই হলো সবচেয়ে বড় অহংকার। আর ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে।[৫]

ইলম সঠিক উদ্দেশ্যে অর্জিত হলে এর রয়েছে অনেক মর্যাদা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।[৬] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'আর জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও'।[৭]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে দুনিয়া হাছিলের লক্ষ্যে ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ 'যে লোক আলেমদের সাথে তর্ক-বাহাছ করা অথবা নিরোধদের সাথে বাকবিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৮] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কেউ সে জ্ঞান পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের অভিপ্রায়ে অর্জন করলে ক্বিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না'।[৯]

বংশমর্যাদা : ব্যক্তিকে সম্মানিত করার ক্ষেত্রে বংশমর্যাদা যে এক দারুণ ভূমিকা পালন করে, তা অনস্বীকার্য। তবে এই মর্যাদা অটুট থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ বংশের লোকেরা বিনয়ী ও তাক্বওয়ার অধিকারী হন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াশীল' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

যদি এটা ব্যতিরেকে কথা ও কর্মে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তাহলে ব্যক্তি স্বীয় সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। ব্যক্তির বংশীয় মর্যাদা তাকে সম্মুখপানে এগিয়ে ততক্ষণ নিয়ে যেতে পারে, যতক্ষণ তার আমল উল্লেখযোগ্য হয়। আর যদি আমলে পশ্চাতে থাকে, তাহলে বংশমর্যাদা এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 'যে লোককে তার আমল পিছনে সরিয়ে দিবে, তার বংশ (মর্যাদা) তাকে অগ্রসর করে দিবে না'।[১০]

ইসলামে বংশমর্যাদা প্রশংসিত হলেও তাক্বওয়া না থাকলে তা নিন্দনীয়। মানুষ স্রেফ বংশীয় মর্যাদা দ্বারা সম্মান লাভ করতে পারে না। যদি না তার মধ্যে তাক্বওয়া যুক্ত হয়। সুতরাং ব্যক্তি যদি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে চায় কিংবা সফলতা অর্জন করতে করতে চায়, তাহলে উচ্চ বংশের অহংকার নয়; বরং তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে।

পদমর্যাদা : উচ্চ পদবি অনেক সময় মানুষকে অহংকারী করে তোলে। পদমর্যাদার বিষয়টি দুনিয়াবী জীবনের জন্য যেমন কঠিন, ঠিক তেমনি এটি পরকালীন জীবনের জন্যও কঠিন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ 'যে ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হলো, সে যেন বিনা ছুরিতে যবেহ হলো'।[১১]

ব্যক্তি যদি হক্কের সাথে দায়িত্ব পালন করে, তাহলে দুনিয়া হারাতে হবে। আর যদি হক্কের সাথে দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে পরকাল হারাতে হবে। মানুষ যে যত বড় দায়িত্বের অধিকারী, তাকে ততো জটিল জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমরা

৫. যাহাবী, আল-কাবায়ের (বৈরূত : দারুন নাদওয়াতিল জাদীদা), পৃ. ৭৮।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।
৭. ইবনু মাজাহ, হা/২২৩, হাদীছ ছহীহ।
৮. তিরমিযী, হা/২৬৫৪, হাদীছ হাসান।
৯. ইবনু মাজাহ, হা/২৫২, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২২৭।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।
১১. আবূ দাঊদ, হা/৩৫৭১, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

প্রত্যেকেই নিজ অধস্তন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম (খলীফা/সরকার), যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধস্তনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধস্তনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তানসন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখো, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১২]

পদমর্যাদার অহংকার এমন একটি বিষয়, যা থেকে সৃষ্টি হয় যুলুম, নির্যাতন আর খেয়ানত। সুতরাং এ বিষয়ে সোচ্চার থাকাই ঈমানের দাবি। খেয়াল রাখতে হবে, পদমর্যাদা যেন আমাদেরকে অহংকারের দিকে ধাবিত করতে না পারে। তারই সাথে সর্বদা মনের গহীনে লালন করতে হবে জবাবদিহিতার ভয়। আদায় করার চেষ্টা করতে হবে ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ এর পূর্ণ হক্ব।

আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদত করা : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। ইবাদতই ইসলামের প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামের মূলেই ইবাদত। ইবাদত ছাড়া ইসলাম অচল, পঙ্গুপ্রায়। কিন্তু এই ইবাদত বা দাসত্ব অনেক সময় মুমিনের অন্তরে অহংকার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি ভুলে যায় তার সৃষ্টির সূচনা। আল্লাহর দাসত্বের মাঝেই খুঁজে ফিরে নিজের বড়ত্ব। হেয় প্রতিপন্ন করে অন্যকে। যার দরুন অন্তরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে যারপরনাই ভূমিকা পালন করে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ একবার খোরাসানের এক বিখ্যাত দরবেশের দরবারে গেলেন। কিন্তু দরবেশ তাকে গুরুত্ব দিলেন না। তখন তাকে বলা হলো, আপনি কি জানেন ইনি কে? ইনি হলেন আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীছ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ। একথা শুনে দরবেশ দ্রুত বেরিয়ে এসে তার নিকট ওযর পেশ করলেন এবং তাকে উপদেশ দিতে বললেন। তখন তিনি দরবেশকে বললেন, যখন তুমি ঘর থেকে বের হবে, তখন তুমি যাকেই দেখবে তাকেই তোমার চাইতে উত্তম বলে ধারণা করবে।[১৩] বকর ইবনু আব্দুল্লাহ মুযানী বলেন, نَظَرْتُ إِلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ فِيهِمْ بِهِ 'আমি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত সবার দিকে তাকালাম এবং ভাবলাম যে এদের সকলকে ক্ষমা করা হয়েছে, যদি না আমি এদের মধ্যে থাকতাম। অর্থাৎ শুধু আমাকেই ক্ষমা করা হয়নি।[১৪]

যুগে যুগে যারা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন, তারা ছিলেন নিরহঙ্কারী, সহজ সরল। সর্বদা অন্যের চাইতে নিজেকে হীন মনে করাই ছিল তাদের আদর্শ বা নীতি। হীন বেশে চলার মধ্যেই তারা লাভ করত আত্মতৃপ্তি, খুঁজে ফিরত সফলতা আর সম্মান।

অহংকার প্রতিকারের উপায় :

অহংকার প্রতিকারের অনেকগুলো উপায় রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

ছোটো কাজ করার মানসিকতা রাখা : ব্যক্তি তখনি সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে, যখন তার কথা ও কর্মে নমনীয়তা প্রকাশ পায়। হৃদয়কে অহংকারমুক্ত রাখার উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো স্বেচ্ছায় ছোটো কাজে অংশগ্রহণ করা। মনে করুন, আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল। সহকারী শিক্ষকদের কিংবা ছাত্রদের কোনো একটা কাজে লাগালেন। এমতাবস্থায় আপনি দাঁড়িয়ে শুধু অবলোকন না করে তাদের সাথে শরীক হলেন, অফিস ঝাড়ু দিলেন কিংবা টয়লেট পরিষ্কার করলেন। এগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছোটো মনে হলেও অহংকার দূরীকরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করা হয়। যার দরুন ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী ও জনগণের নিকট সম্মানের পাত্র হন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতা নিজেই ঠিক করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং গৃহের কাজকর্ম করতেন, যেমন তোমাদের কেউ স্বীয় গৃহের কাজকর্ম করে থাকে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা এটাও বলেছেন যে, তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষই ছিলেন। নিজের কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতেন, নিজ বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন।[১৫]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব এমন ছোটো কাজ করেছেন তার বাস্তব জীবনে, এতে তার সম্মানের একটুও ঘাটতি হয়নি। বরং

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩৮।
১৩. খাত্ত্বাবী, আল-উযলাহ (মাতবাআ সালাফিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ৮৯।
১৪. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৮২৫২।
১৫. আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৪১; আহমাদ, হা/২৫৩৮০; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৪৪০; মিশকাত, হা/৫৮২২।

তিনিই পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বোত্তম মডেল। তাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামও রাযিয়াল্লা-হু আনহুম পশ্চাতে ছিলেন না। আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু একদা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজার অতিক্রম করছিলেন। এমন দৃশ্য দেখে একজন ব্যক্তি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! আল্লাহ কি আপনাকে এমন কাজ করা থেকে অমুখাপেক্ষী করেননি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি এ কাজের মাধ্যমে আমার অহংকার দূরীভূত করতে চাই। কেননা আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৬]

মৃত্যুর কথা স্মরণ করা : নশ্বর এই প্রথিবীতে যার জন্ম হয়েছে, তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে। মরণ থেকে কেউ রক্ষা পায়নি, পাচ্ছে না আর পাবেও না। মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিকুলের জন্য অবধারিত সত্য, যার যখন মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে উঠবে, তাকে তখন যেতে হবে। যেতে হবে সেই সত্তার নিকট, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ যদি মরণ থেকে পলায়ন করে অতি মযবূত প্রাসাদে অবস্থান করে, তবুও মরণ তাকে পাকড়াও করবেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করো' *(আন-নিসা, ৪/৭৮)*। ব্যক্তি যদি অহংকার থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, তাহলে তাকে সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে। যার দরুন হৃদয়ের লালিত অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ 'তোমরা দুনিয়ার ভোগবিলাস বিনষ্টকারী জিনিস মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো'।[১৭]

গোপন আমল করা : ব্যক্তিকে অহংকার মুক্ত রাখতে জোরালোভাবে ভূমিকা পালন করে গোপন আমল। এর মাধ্যমেই ব্যক্তির অন্তরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যে অন্তরে ইখলাছ নিহিত, সে অন্তরকে অহংকার তেমনভাবে আক্রমণ করতে পারে না। ইয়াকূব আল-মাকফূফ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখলেছ হলো সেই ব্যক্তি, যে তার নেকীর কাজগুলো সেভাবে গোপন করে, যেভাবে পাপের কাজগুলো গোপন করে'।[১৮] পাপকর্মের ন্যায় ব্যক্তি যখন স্বীয় সৎকর্ম গোপন করে, তখন তার অন্তরে কোনো রকম অহংকার অবশিষ্ট থাকে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর বিশেষ ছায়াতলে থাকবেন। তাদের একজন হলেন ঐ ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে এমনভাবে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না ডান হাত যা ব্যয় করে এবং ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়'।[১৯]

কোনোক্রমে অহংকার প্রকাশ পেলে তৎক্ষণাৎ পরিহার করা : মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন বৈশিষ্ট্যেই সৃষ্টি করেছেন। তবে এই ভুল ততক্ষণ নিন্দনীয়, যতক্ষণ মানুষ তা অবগত হওয়ার পরেও তাতে অবিচল থাকে। অন্যতম জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুতার্রিফ ইবনু আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পক্ষ হতে নিযুক্ত খোরাসানের গভর্নর মুহাল্লাব ইবনু আবূ ছফরাকে একদিন দেখলেন রাস্তা দিয়ে খুব জাঁকজমকের সাথে যেতে, তিনি তার সামনে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কীভাবে রাস্তায় চলছ যা আল্লাহকে রাগান্বিত করে? একথা শুনে মুহাল্লাব বললেন, আপনি কি আমাকে চিনেন? তাবেঈ বিদ্বান বললেন, হ্যাঁ, চিনি। তোমার শুরু হলো একটি নিকৃষ্ট শুক্রাণু থেকে এবং শেষ হলো একটি মরা লাশ হিসাবে, আর তুমি এর মধ্যবর্তী সময়ে পায়খানার ময়লা বহন করে চলেছ। একথা শুনে মুহাল্লাব জাঁকজমকতা ছেড়ে সাধারণভাবে চলে গেলেন।[২০]

সুতরাং অহংকার দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সাথেই তা পরিহার করা জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য।

দু'আ করা : হৃদয়কে অহংকারমুক্ত রাখার জন্য আল্লাহর নিকট অবশ্যই দু'আ করতে হবে। কেননা দু'আই মুমিনের মূল হাতিয়ার।

পরিশেষে বলতে চাই, আসুন! আমরা যাবতীয় অহংকার ছেড়ে আল্লাহর প্রেরিত মহাসত্যের পানে ফিরে আসি। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ 'আমাদের আয়াতসমূহে কেবল তারাই ঈমান আনে, যখন তারা উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা জ্ঞাপন করে এমন অবস্থায় যে, তারা কোনো প্রকার অহংকার প্রদর্শন করে না' *(আস-সাজদাহ, ৩২/১৫)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে অহংকার থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৬. সিলসিলা ছহীহা, হা/৩২৫৭, ১৩/৬০।
১৭. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/১৬০৭।
১৮. ইহইয়ায়ু উলূমিদ্দীন, ৩/৩৭৮।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৪২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১।
২০. তাফসীরে কুরতূবী, আল-মাআরিজ, ৭০/৩৯।

জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৭)

অন্যান্য খলীফার শাসনামলে বায়তুল মুক্বাদ্দাস: শ্রেষ্ঠ চার খলীফার শাসনকে বলা হয় খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল, যার ব্যাপ্তি প্রায় ৪০ বছর। তারপর উমাইয়া খেলাফাত, যার ব্যাপ্তি প্রায় ১৫০ বছর। তারপর আব্বাসীয় খেলাফত, যার ব্যাপ্তি প্রায় ৬০০ বছর। আব্বাসীয় খেলাফত আমলের একটি যুগ শক্তিশালী যুগ আরেকটি যুগ দুর্বল যুগ। আব্বাসীয় খেলাফতের শক্তিশালী যুগে আমরা খলীফা হারূন-অর-রশীদ, খলীফা মামূনুর রশীদের নাম জানি এবং শুনেছি। আর আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বল যুগে আব্বাসীয় খলীফার কোনো শক্তি, কোনো ক্ষমতা, কোনো দাপট, কোনো শৌর্য-বীর্য ছিল না। নামকাওয়াস্তে তাদেরকে খলীফা রাখা হতো আর শক্তি ক্ষমতা থাকত আঞ্চলিক বিভিন্ন ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর বা সাম্রাজ্যগুলোর হাতে। তার মধ্যে প্রথমদিকের সাম্রাজ্য হচ্ছে- ফাতেমীয় শীআ, উবাইদী, বাতেনী রাজ্য। দীর্ঘকালব্যাপী আব্বাসীয় খেলাফাতে তাদের প্রভাব ছিল। তারপরে এসেছে সেলজুক সাম্রাজ্য। তার পরে এসেছে আইয়ূবী। তারপরে মামলূকদের সাম্রাজ্য। এই তিন চারটা আঞ্চলিক শক্তির অধীনে তখন আব্বাসীয় খেলাফত পরিচালিত হতো নামকাওয়াস্তে। যেমন এখন ইংল্যান্ডের রাজা আছে, রাণী আছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। এরকম বহু দেশে রাজা-রাণী প্রথা এখনো অব্যাহত আছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাদের কাছে কোনো ক্ষমতা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের কাছে নেই। ঠিক এরকম একটা অবস্থায় চলে গিয়েছিল আব্বাসীয় খেলাফত। নামকাওয়াস্তে খলীফা পদ আছে, তবে সকল ক্ষমতা বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির হাতে।

এই খেলাফত আমলগুলোর মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকেন্দ্রিক সবচেয়ে বেশি খেদমত হয় উমাইয়া শাসনামলে। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন উমাইয়ারা ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন দারুল খেলাফাহ (রাজধানী) মদীনা থেকে পরিবর্তন হয়ে সিরিয়ার দামেস্কে চলে আসে। কেননা মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। তাই তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও শক্তিশালী শহর ছিল দামেস্ক। আর তাঁর পরবর্তী বংশধরদের দারুল খেলাফাহ বা রাজধানী ছিল দিমাস্ক। মানচিত্রে দেখলে দেখবেন যে, দামেস্ক থেকে অতি নিকটে হচ্ছে ফিলিস্তীন বা জেরুযালেম। বরং তৎকালীন যুগে আজকের ফিলিস্তীন, লেবানন, জর্ডান ও ইসরাঈল সবই সিরিয়া বা শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য উমাইয়া শাসন আমলে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের যত খেদমত হয়েছে, যত সেবা হয়েছে, যত উন্নতি ঘটেছে- তা অন্য কোনো শাসন আমলে ঘটেনি। কেননা আব্বাসীয় খেলাফতের দারুল খেলাফাহ ছিল বাগদাদ। যেটা জেরুযালেম থেকে দূরে কিন্তু দামেস্ক জেরুযালেম বা বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে কাছে।

আরেকটি কারণে উমাইয়া শাসনামলে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খেদমত সবচেয়ে বেশি হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিদ্রোহের কারণে তার অধীনে হেজায থাকার ফলে উমাইয়ার অনেক বড় শাসকগণ মক্কা এবং মাদীনা থেকে দূরে ছিলেন। তাই তারা তৃতীয় পবিত্রতম স্থান হিসেবে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের প্রচুর খেদমত করার চেষ্টা করেছেন।

তাদের খেদমতের একটা বড় অংশ ছিল পুরো মিশরের টানা সাত বছরের পুরো রাজস্ব আয় বায়তুল মুক্বাদ্দাস বা জেরুযালেমের উন্নয়নে ব্যয় করা। আর তখনই কুব্বাতুছ ছাখরা বা ডোম অব দ্য রক নির্মিত হয়। আমরা যে স্বর্ণালি গম্বুজটি দেখতে পাই, উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসন আমলেই তা নির্মিত হয়। উল্লেখ্য, অনেকে এখন মনে করে যে, কুব্বাতুছ ছাখরাই হয়তো বায়তুল মুক্বাদ্দাস, আবার অনেকে মনে করে যে, না কুব্বাতুছ ছাখরা হয়তো বায়তুল মুক্বাদ্দাস নয়। সঠিক মত হচ্ছে, সরেজমিন থেকে উঁচু প্রাচীরঘেরা পুরো এরিয়াটাই পবিত্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত। যেখানে কুব্বাতুছ ছাখরা আছে, গীর্জা আছে, মসজিদে আক্বছা আছে তার সবগুলোই পবিত্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত।

বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পতন: আব্বাসীয় শাসনামলের দুর্বল সময়ে যখন ফাতেমীয় উবাইদিয়াদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি

ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

ছিল, তখনই মূলত মসজিদে আক্বছা পতনের সূচনা হয়। তারা জামিআতুল আযহার নির্মাণ করেছিল শীআ মাযহাব প্রচার করার জন্য। ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যায় যে, যখন তারা মিশরের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন তারা মসজিদের দরজায় দরজায়, বাড়ির দরজায় দরজায় উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নামে গালিগালাজ, মিথ্যা অপবাদ লিখে দিয়ে আসত, ঝুলিয়ে দিয়ে আসত এবং মানুষকে গালিগালাজ করতে বাধ্য করত। সুন্নী মাযহাবের বড় বড় আলেম-উলামাকে হত্যা করা, যবেহ করা, নির্যাতন করা, যুলুম করা এগুলো তাদের চিরাচরিত স্বভাবের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরো ক্রুসেডের যুদ্ধের যারা ইতিহাস পড়বেন তারা সবাই দেখবেন যে, ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মুনাফেক্বী শীআরাই করেছে।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুজাহিদ নেতা ইমাদুদ্দীন জিনকি ও নূরুদ্দীন জিনকির মতো বড় বড় শাসককে তারা হত্যা করেছে। সবসময় তারা ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাত করেছে গোপনে। যাহোক, মিশরের মাটিতে যেমন ফাতেমীয় উবাইদিয়া শীআদের উত্থান হয়, ঠিক তেমনি তার পাশাপাশি তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমন্তঘেঁষা অঞ্চলে সেলজুক সালতানাতের উত্থান হওয়া শুরু করে।

সেলজুক সালতানাত বা সেলজুক সাম্রাজ্যের উত্থান হলে স্বয়ং আব্বাসীয় খলীফা আল-কায়েম বি আমরিল্লাহ সেলজুক সুলতানকে আমন্ত্রণ জানান বাগদাদ দখল করে এই শীআদের নিকট থেকে তাকে পরিত্রাণ দিতে। সেলজুকদের মহান সুলতান আলাপ আরসালান, তিনি বাগদাদ গিয়ে শীআদের নিকট থেকে বাগদাদকে উদ্ধার করত: পুরো মুসলিম বিশ্বে সেলজুক সালতানাতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আর সেলজুক সালতানাতের মাধ্যমে আব্বাসীয় খেলাফাত পুনরায় সুন্নীদের কর্তৃক প্রভাবিত এবং সারা মুসলিম বিশ্বে সঠিক আক্বীদা এবং সঠিক আমলের প্রচারের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

ক্রুসেডারদের ফিলিস্তীন আক্রমণের ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয় মূলত সেলজুক সুলতানদের তুরস্ক আক্রমণের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, আজকের তুরস্ক এবং তখনকার কনস্টান্টিনেপোল যা বাইজাইটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী তখনো মুসলিমদের দ্বারা বিজিত হয়নি; বরং ক্রুসেডারদের ক্রুসেডের পুরো সময়ের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তুরস্কের মাটি।

সেলজুক সালতানাতের মহান সম্রাট আলাপ আরসালান, তিনি এই কনস্টান্টিনোপোল বিজয় করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। সেই বিখ্যাত যুদ্ধকে বলা হয় মেলাযকুর্দের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়। বাদশাহ রোমান্স গ্রেফতার হন। যদিও আলাপ আরসালান কনস্টান্টিনোপোল বিজয় করতে পারেননি, কিন্তু এই ভয়ংকর যুদ্ধের খবর যখন ইউরোপে পৌঁছে যায়, তখন তারা আশঙ্কা করে যে, কনস্টান্টিনোপোলের পতন হয়ে যেতে পারে। এই পতনের আশঙ্কা থেকেই মূলত ক্রুসেড আরম্ভ হয়। তারা কনস্টান্টিনোপোল রক্ষায় মুসলিমদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। উল্লেখ্য, তৎকালীন ইউরোপে রাজা-বাদশাদের তেমন কোনো মূল্য ছিল না। সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ছিল গীর্জার পাদরিদের। গীর্জার পাদরিরা চাইলে যে-কোনো শাসককে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারতেন। গীর্জার শাসকেরা চাইলে যে-কোনো শাসককে ক্ষমতায় বসাতে পারতেন। এই অবস্থা ছিল ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন ও জার্মান থেকে শুরু করে সকল বড় ইউরোপিয়ান দেশগুলোর।

সেই সময়ের গীর্জার পাদরিদের উসকানিতেই মূলত ক্রুসেডের শুরু হয়। ক্রুসেডাররা দুইটা রাস্তা দিয়ে আসত। স্থলপথে আসলে তুরস্ক দিয়ে আসত; তুরস্ক দিয়ে ভূমধ্যসাগরের ধার হয়ে ত্রিপলি, আক্কা, হাইফা, তেল আবিব, গাজা ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে ফিলিস্তীনে প্রবেশ করত। অথবা দ্বিতীয় রাস্তা হলো সরাসরি পানিজাহাজে ভূমধ্যসাগরের কোনো এক তীরে অবতরণ করে ফিলিস্তীনে প্রবেশ করা।

এখানে আরো একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, তৎকালীন সময়ের ইউরোপ আজকের মতো উচ্চশিক্ষিত উন্নত ইউরোপ ছিল না। তখন মূলত ছিল ইউরোপের অন্ধকার যুগ। যখন বাগদাদ আলোকোজ্জ্বল ছিল। গ্রানাডা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল, তখন ইউরোপ ছিল অন্ধকার। ছিল গরীব, মিসকীন, ফকীর, গণ্ডমূর্খ ও জাহেল। পাদরিদের উসকানিতে এই ধরনের হাজারো-লাখো গণ্ডমূর্খ জাহেল অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্বরকে পাঠানো হয়েছিল মুসলিমদেরকে হত্যা করার জন্য। প্রথম ক্রুসেডে তাদেরকে পরাজিত হতে হয়। প্রথম ক্রুসেডে ইউরোপ কোনো প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী পাঠায়নি। জার্মান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশের অশিক্ষিত, অসভ্য, মূর্খ, জাহেল, বর্বর, কৃষক শ্রেণির মানুষদেরকে স্রোতের পালের মতো পাঠানো হয়েছিল প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে। তখন এই সেলজুক সালতানাতেরই একজন

সম্রাট ছিলেন কিলিজ আরসালান। তিনি প্রথম ক্রুসেডে তাদেরকে একদম কচুকাটা করে শেষ করেছিলেন। ভয়ংকরভাবে পরাজিত করেছিলেন। ক্রুসেডাররা ভাবল এরকম সাধারণ মানুষকে উসকিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে লাভ নেই। প্রশিক্ষণের দরকার আছে। তখন তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনাবাহিনী তৈরি করল, যাদেরকে বলা হতো নাইট যোদ্ধা।

প্রশিক্ষিত নাইট যোদ্ধাদের মাধ্যমে শুরু হয় দ্বিতীয় ক্রুসেড। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শক্তিশালী সেলজুক সালতানাত যেখানে প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে ইউরোপিয়ানদের চরমভাবে নাকানিচুবানি খাইয়ে বিতাড়িত করেছিল; সেই সেলজুক সালতানাতের এমনভাবে অধঃপতন হলো, যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ভাইয়ে ভাইয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আলাপ আরসালানের পরবর্তী সন্তানেরা তাঁর পৌত্রেরা, চাচা-ভাতিজা, ভাই-ভাই এমনভাবে গণ্ডগোল এবং মারামারি শুরু হয়ে গেল যে, কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা অবশিষ্ট থাকল না। কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বাকী না থাকার কারণে হালাব (সিরিয়ার একটা শহর), হালাব-এর একজন আমীর; হিমস (সিরিয়ার একটা শহর) হিমস-এর একজন আমীর; দামেস্ক (সিরিয়ার একটা শহর) সেটার একজন আমীর। ত্রিপলি, (এটা লিবিয়ার ত্রিপলি নয়। সিরিয়ারই ত্রিপলি) তার একজন আমীর। আক্কা আলাদা শহর, আলাদা আমীর। হাইফা আলাদা শহর, আলাদা আমীর। এভাবে পুরো সিরিয়া যাবতীয় কেন্দ্রীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে খণ্ডবিখণ্ড আকার ধারণ করল। শুধু তাই নয়, এক আমীর আরেক আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ চলতে থাকে; কোনো কেন্দ্রীয় শাসন নেই। এই রকম দুর্বল সময়ে দ্বিতীয় ক্রুসেড আসে এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডাররা বিনা বাধায় তুরস্ক থেকে সমুদ্রের তীর হয়ে একদম বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ ছাড়াই, কোনো সমস্যা ছাড়াই বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল করে নেয় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পতন ঘটে।

এটা ছিল ১০৯৯ খৃস্টাব্দ, মোতাবেক ৪৯২ হিজরী; ১৫ই জুন, শা'বান মাস। ক্রুসেডাররা জেরুযালেমে প্রবেশ করে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পতন হয় এবং ৭০ হাজারেরও বেশি মুসলিমদেরকে তারা একই দিনে যবেহ করে জেরুযালেমে। ৭০ হাজারেরও অধিক মুসলিমকে তারা একদিনে যবেহ করেছে ফিলিস্তীনের জেরুযালেমে। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, ক্রুসেডারদের ঘোড়ার পাগুলো মুসলিমদের রক্তের স্রোতে ডুবে গিয়েছিল।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা: বায়তুল মুক্বাদ্দাস পতনের পর রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে ৫০৫ হিজরীতে সর্বপ্রথম উদ্ধার যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। যেহেতু বাগদাদ তখন মারকাযুল ইলম বা জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল এবং বাগদাদে মাদরাসা নিজামিয়া ছিল, মানুষজনের মাঝে জ্ঞানের চর্চা ছিল। মানুষজনের চাপে পরে তৎকালীন বাগদাদের নামকাওয়াস্তে আব্বাসী খলীফা কেন্দ্রীয় শাসনবিহীন রাজা-বাদশাহদেরকে ডেকে একটি রাজনৈতিক ঐক্য করেন। রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। এই রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই মুনাফেক্বী দেখা দেয়। কেননা এটি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছিল না, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল না, বায়তুল মুক্বাদ্দাস অর্জনের ইচ্ছা ছিল না; নিজের ক্ষমতা টিকানোর স্বার্থ ছিল, নিজের দেশ বা নিজের মাতৃভূমি বা নিজের ক্ষমতা, নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ধরে রাখার স্বার্থ ছিল।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস মুক্ত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কোনো জাতীয়তাবাদী ধারা, জাতীয়তাবাদী মতবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ দিয়ে জেরুযালেম বিজয় সম্ভব নয়।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস উদ্ধারের পটভূমি: বায়তুল মুক্বাদ্দাস উদ্ধারের সূচনা মূলত সেলজুক সুলতানদের আমলেই শুরু হয়। যখন তারা আব্বাসীয় খলীফার অনুরোধে বাগদাদ থেকে শীআদের বিদায় করলেন, তখন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকে সুন্নী মাযহাবের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য বাগদাদে মাদরাসা নিজামিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শীআ, উবাইদী, ফাতেমীয়রা যেমন জামি'আতুল আযহার প্রতিষ্ঠা করেছিল শীআ মাযহাম প্রচারের জন্য, তেমন তাদের কাছ থেকে বাগদাদকে মুক্ত করার পর, সঠিক আক্বীদা, সঠিক আমল, সঠিক বিশ্বাস প্রচার করার জন্য মাদরাসা নিজামিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মাদরাসা নিজামিয়া থেকে পরবর্তীতে বড় বড় আলেম-ওলামা, বড় বড় মুহাদ্দিছের আবির্ভাব হয়েছে। তারিখে দিমাস্কের লেখক ইবনু আসাকের, গাযালী, আল-ইয বিন আব্দুস সালামের মতো বড় বড় আলেম-ওলামা এবং ঐতিহাসিকদের জন্ম, উত্থান এবং পড়াশুনা এই মাদরাসা নিজামিয়ায়। মাদরাসা নিজামিয়ার এই আমল-আখলাক এবং জ্ঞানের চর্চা, সঠিক আক্বীদা এবং আমলের চর্চা থেকেই মূলত পরবর্তীতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো মুজাহিদ তৈরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।

যে নিজামুল মুলক মাদরাসা নিজামিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন তিনি সেলজুক সালতানাতের একজন মন্ত্রী ছিলেন।

যাকে ইসলামের ইতিহাসের মহান মন্ত্রী বলা হয়, সবচেয়ে মহান মন্ত্রী, ওয়াজিরে 'আলা। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, তাক্বওয়াবান, আল্লাহভীরু মানুষ। তার খলীফা মালিক শাহও পরহেযগার, তাক্বওয়াবান, আল্লাহভীরু মানুষ। এই দুইজনের যিনি নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন নূরুদ্দীন জিনকির দাদা এবং ইমাদুদ্দীন জিনকির পিতা।

তথা সেলজুক সালতানাতের একজন কর্মচারী বা নিরাপত্তারক্ষীর বংশধর থেকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ক্রুসেডারদের পতনের যাত্রাটা শুরু করেন। ইমাদুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ মুসেলের আমীর মওদূদের সাথে থেকে জেরুযালেম উদ্ধারের প্রথম রাজনৈতিক ঐক্যের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। মুসেলের আমীর মওদূদের মৃত্যুর পর ইমাদুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ নিজে মুসেলের আমীর হন। তাঁর অন্তরের ইখলাছ, তাঁর অন্তরের নিঃস্বার্থ চাওয়া শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দাস উদ্ধার করা। ইমামুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ সামান্য মুসেল, সিরিয়ার শহর মুসেলের আমীর হয়ে তিনি দুইটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। যে দুইটা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হলে বায়তুল মুক্বাদ্দাস মুক্ত করা সম্ভব নয়:

(১) সিরিয়ার বিভিন্ন শহরভিত্তিক শতধা বিভক্ত ইমারতগুলোকে এক শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুসলিমদের ঐক্য হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতার ঐক্য। দুই দল এক হওয়া ঐক্য নয়। দুই আলেম এক হওয়া ঐক্য নয়। একক শাসনব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হওয়াই ঐক্য।

(২) সিরিয়ার সকল শহরকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনস্ত করার পরপরই মিশর আর সিরিয়াকে একত্রিত করতে হবে। যদি মিশর ও সিরিয়াকে এক শাসনের অন্তর্ভুক্ত না করা যায়, তাহলে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় করা সম্ভব নয়। আজকেও আপনি ম্যাপ খুলে দেখেন যে, তৎকালীন সিরিয়া বা আজকের জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশ যদি এক না হয়, পাশাপাশি তাদের সাথে মিশর যদি এক না হয়, তাহলে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় করা সম্ভব নয়।

ইমাদুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করত সিরিয়ার বিভিন্ন শহরগুলোকে তার অধীনস্ত করা শুরু করে দিলেন। ইমাদুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ-এর পরে তাঁর ছেলে নূরুদ্দীন জিনকি এই একই ঝাণ্ডা বহন করলেন। একই টার্গেট। মিশর সিরিয়া এক শাসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় করতে হবে, নতুবা সম্ভব নয়। নূরুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ মুসলিমদেরকে উজ্জীবিত রাখার জন্য এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় করার মানসিক উদ্দীপনা তৈরি করার জন্য একটা বিশাল মিম্বার তৈরি করলেন। মিম্বার তৈরি করে ঘোষণা দিলেন- যেদিন বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় হবে, সেদিন এই মিম্বার বায়তুল মুক্বাদ্দাসে স্থাপন করা হবে। এই মিম্বার মানসিকভাবে মুসলিমদেরকে উজ্জীবিত রাখতে সহযোগিতা করে। নূরুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ মোটামোটি সিরিয়ার বড় শহরগুলোকে নিজের অধীনে করে নিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর পিতা এই কাজ শুরু করেছিলেন, তিনিও একই পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। বাকী ছিল শুধু মিশর। আর মিশরে তখন উবাইদী শীআ এদের শাসন অব্যাহত আছে। বাগদাদ মুক্ত হয়েছে কিন্তু মিশর মুক্ত হতে পারেনি। তখন নূরুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ তাঁর প্রধান সেনাপতি আসাদুদ্দীন শেরকোকে পাঠালেন মিশরকে মুক্ত করার জন্য এই মুনাফেক্ব শীআদের কবল থেকে। আসাদুদ্দীন শেরকো তাঁর ভাতিজা ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীকে সাথে করে নিয়ে মিশর গেলেন শীআ, উবাইদী, ফাতেমীদের কবল থেকে মিশরকে উদ্ধার করার জন্য। প্রথমবার ব্যর্থ হলেও, পরবর্তীতে তিনি সফল হন। সফল হওয়ার পর তিনি মিশরে ২৫ বছরের যুবক ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীকে মিশরের শাসক নির্ধারণ করে নূরুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ-এর নিকটে ফিরে আসেন। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ মিশরের শাসনভার গ্রহণ করার পরে উবাইদী, শীআ ফেতনাকে জড় থেকে সমূলে উৎখাত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মিশরকে শীআ মুক্ত করার এই সংস্কার কাজের দুই তিন বছর যেতে না যেতেই প্রধান নেতা নূরুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। নূরুদ্দীন জিনকি রহিমাহুল্লাহ-এর মৃত্যুর পরে একদল কুচক্রী মহল তাঁর ১০/১১ বছরের সন্তানকে শাসক বানিয়ে খেলাফতের ঘোষণা দিয়ে দেয়। তখন ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ বিপদে পড়ে যান। কেননা ১০ বছরের শিশুর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। আশেপাশের কুচক্রী মহল দ্বারা প্রভাবিত সে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর বাস্তবে হলোও তাই। ক্রুসেডার ও শীআদের যৌথ চক্রান্তে সিরিয়ার মসনদ থেকে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী-বিরোধী প্রচারণা শুরু হয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ মিশর থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে সিরিয়া অভিযান পরিচালনা করেন। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ পুনরায় পুরো সিরিয়া আর পুরো মিশরকে নিজের এক শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। সিরিয়া এবং মিশর যখন এক শাসনের অন্তর্ভুক্ত শেষে এখন কাজ শুধু বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় করা।

(চলবে)

শুকরিয়া জানাই মহান রবের

-মাজহারুল ইসলাম আবির*

[১]

জীবনের তিক্ত এক সময়। যেই সময়ে হারিয়ে ফেলেছিলাম জীবনের সবটুকু আনন্দ। ভুলে গেছিলাম সুখ কী জিনিস! প্রতিটা সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা যাচ্ছিল গুনে গুনে। আমাকে বলে যাচ্ছিল, আমি যাচ্ছি। হতাশা আর মনোব্যথার তীব্র ঝড় আমাকে লন্ডভন্ড করে দিচ্ছিল বারবার। কষ্টের কাঁটার কাছে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকও লজ্জা পাচ্ছিল। আমার চোখ হয়েছিল ঝরনা আর মুখাবয়ব ঝরনা বেয়ে নামা পাহাড়ের মতো। দিলের কান্নার সুর আকাশের সান্নিধ্য লাভ করেছিল। ভালো লাগার ছিটেফোঁটাও তখন ছিল না আমার মনে। কেবল রবের কাছেই নিঃশব্দে কাঁদতাম। সকাল, দুপুর, রাতে। সময়, অসময়ে। প্রত্যেক ছালাতে মুনাজাতে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিতাম। প্রতিক্ষণে বুকে এসে বিঁধছিল ব্যথার সুচ। হৃদয়ে ক্ষতের কোনো মলম খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। পৃথিবীটা আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। মরে যেতে ইচ্ছে করছিল বারবার। সেই সময়ের দুঃখ প্রকাশের ভাষা নেই।

একদিন একটুখানি ভাল্লাগার সন্ধানে ভাইয়ের সাথে বাইরে গেলাম। কিন্তু...। পুরো জগতটা যেন আমার চারপাশে ঘুরছিল। মাথাটাও টলমল করছিল। মনে হচ্ছিল, চলন্ত গাড়িগুলো সব আমার দিকেই ধেয়ে আসছে। শহরে কোথায়, কখন চোখের পানি পড়েছে, জানি না। তখন আমি যেন একটা প্রাণহীন দেহ। অটোতে ফেরার পথে মনের তীব্র ব্যথা আর হতাশা নিয়ে ভাইয়ার কাঁধে মাথা রাখলাম। আমার অশ্রু ভিজিয়ে দিচ্ছিল তার পাঞ্জাবী। টপটপ করে তার কাঁধে ঝরছিল বৃষ্টি। এ বৃষ্টি আকাশের মেঘমালার নয়। এ বৃষ্টি মনের অবর্ণনীয় কষ্টের।

হঠাৎ কোনো কারণে আমাদের অটোটা রাস্তার একপাশে দাঁড়াল। আর আমার দৃষ্টি নিবিষ্ট হলো রাস্তার পাশের এক হুইল চেয়ারে। সেই চেয়ারে বসা ছিল আমার চেয়ে দু'এক বছরের বড় দু'জন ছেলে। তাদের আসলে দু'জন বলা যায় কিনা, জানি না! কারণ, তারা একই দেহের দুটো প্রাণ মাত্র। তাদের দেখামাত্র আমার বেদনাবেষ্টিত চিত্ত থেকে কৃতজ্ঞতা স্বরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে এলো, আলহামদুলিল্লাহ।

আমার মতো এত দুঃখী নয়তো কারো জীবন— এই ভাবনাটা তাদের দেখামাত্রই উবে গেল। এই যে, একই দেহের দুটো মানুষ! কত কষ্টই না তাদের জীবনে! কতইনা তারা অবহেলিত, অপমানিত এই ধরার বুকে। কতইনা তারা বোঝা আত্মীয়স্বজনের কাছে। কত মানুষ তাদের দেখে নাক শিটকায়। আমাদের তুলনায় তাদের জীবন কতইনা নিষ্ঠুর। কতইনা বেদনাবিধুর! যার প্রমাণ, তাদের গণ্ডবেয়ে নামা দু'ফোটা অশ্রু!

এক্ষণে রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীছ আমার বড্ড মনে পড়ছে। তাঁর অমীয় বাণী, 'তোমরা তোমাদের চেয়ে নিচু স্তরের দিকে দৃষ্টি রাখবে, উঁচু স্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখবে না। তাহলে তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অবজ্ঞা করার অপরাধ হতে রক্ষা পাবে'।[১]

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারাটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। যখন আমরা আমাদের উপরের শ্রেণির মানুষদের প্রতি তাকাব, তখন অকৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ছেয়ে যাবে। বারবার মনে হবে, ওর আছে আমার কেন নেই? আল্লাহ কেন আমাকে তাদের মতো দেননি?! কিন্তু আমরা যখনই পিছন ফিরে নিচের স্তরে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকাব, তখনই মন কৃতজ্ঞতার বর্ষণে কানায় কানায় ভরে উঠবে।

যদি ভাবি ওই মানুষটার কথা, যার নেই একটি হাত, অথবা দুটো, একটি পা, অথবা দুটো। যেই মানুষটা অর্ধশরীরী। তাদের থেকে কি আমাকে ভালো রাখেনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা?

ওই যে ওই পাগলটা! যার দিকে আমরা কতইনা হেয়, তুচ্ছ আর অবজ্ঞার তির ছুড়ি। তার থেকে কি আমরা ভালো নেই? আমরা কত রঙের, কত ঢঙের পোশাক পরছি প্রতিনিয়ত। কিন্তু একটিমাত্র ছিঁড়া কাপড়ই যার আবরণ, তার হৃদয়টা কতটা আহত!

* শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬৩; মিশকাত, হা/৫২৪২।

ওই যে পথশিশুটা, যে কিনা সামান্য কিছু খাবারের জন্যে সারাটাদিন রাস্তায় রাস্তায়, স্টেশনে স্টেশনে বা ডাস্টবিনে বোতল, প্লাস্টিক, কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়!

ওই যে মানুষটা, আস্তাকুঁড়ের পাশের পচা জায়গাটা যার বাসস্থান। প্রতিক্ষণে যে লজ্জারাঙা হাতদ্বয় পেতে থাকে মানুষের দেওয়া দুটো পয়সার আশায়! তাদের জীবনটা কতইনা কষ্টের!!!

আকাশের চাঁদ-তারা, অপরূপ এই ধরা! আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাই! পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বাতাসের পরতে পরতে ভাসতে থাকা কত্ত রকম ধ্বনি, যা আমরা অনায়াসেই শুনতে পাই! মনের মাঝে জমা কত্ত দুঃখকথা, সুখগাঁথা, যা আমরা কত সহজেই কথামালায় প্রকাশ করতে পারি।

কিন্তু যাদের চোখ নেই, যার আলোও আঁধার, আঁধারও আঁধার! যার নেই শ্রবণশক্তি, নেই কথা বলার ক্ষমতা! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কি তাদের তুলনায় ভালো অবস্থানে রাখেননি!?

[২]

মাঠে মাঠে ফসলের বাহার, যেগুলো আমাদের জোগায় আহার। যদি এমন না হতো, জমে যেত ক্ষুধার পাহাড়। হয়ে যেতাম বড়ই আকাল। যদি না থাকত গাছে ভরা ফল; গরু, ছাগল, মুরগির পাল, কোথা থেকে পেতাম আহার? কখনো কি শুকরিয়া জানানো হয়েছে, এসবের মালিকানা যার?

এই যে পানির বাহার— নদী, নালা, সাগর। আকাশের বৃষ্টি ঝুমুর ঝুমুর। যেই পানি ছাড়া মুহূর্তেই ফুরাবে জীবনের প্রহর। শুকিয়ে যাবে গাছপালা, চারিপাশ, মৃত্তিকা, শহর। হয়ে পড়বে সব নিথর। অথচ কত অনুগ্রহে রব দিয়েছেন এই নেয়ামত! আমরা করি কি এসবের শুকরিয়া?

এই যে বায়ু-বাতাস, যা বিহীন চলত না শ্বাস। যা ছাড়া মৃত্যু করবে গ্রাস। এই যে আগুন। তার কতসব গুণ, যার দ্বারা তৈরি করি খাবার, পেয়ে যাই আহার। এর জ্বালানি-কাঠেরও তো রয়েছেন এক স্রষ্টা। কখনো কি করা হয় এসবের বিনিময়ে প্রসংশা?

এসবের কথাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ওয়াক্বি'আর ৬৩-৭৪ নং আয়াতে বলেছেন।

যিনি দিয়েছেন কর্মমুখর দিন। দিন শেষে আবার নিস্তব্ধ রাত। সমস্ত ক্লান্তি, ব্যস্ততা দূর করতে দিয়েছেন ঘুম। ঘুম শেষে দুধের শিশুর হাসির মতো মিষ্টি ভোর। আরো দিয়েছেন সূর্যাস্তের নির্মল কোমল আভা। দিয়েছেন আকাশের ওপরে আকাশ। যার মাঝে শুভ্র চন্দ্র। চাঁদের জোছনা। আলোতে ভরা সূর্য।

সূর্যাস্তে নদীর জলে সূর্যের স্নিগ্ধ ছায়া। বসন্তের নানা রঙের নানা ঢঙের পুষ্পকলির সৌন্দর্যের মেলা। শীত শেষে পল্লবরাজির ঝরে পড়া। শরতে তুলোতুল্য মেঘের উড়াউড়ি। হেমন্তে ফসলের গোলা। শীতে লেপ-কাঁথা মুড়ানো ঘুম। গ্রীষ্মে মিষ্টি মিষ্টি ফল। বর্ষায় নানান রূপের বৃষ্টি। এগুলোতে মুগ্ধ হয়ে কখনো কি বলা হয়— 'সুবহানাল্লাহ?'

আরো দিয়েছেন আম্মু-আব্বুর মতো অতুলনীয় নেয়ামত। দিয়ে থাকেন প্রিয়তমা-অর্ধাঙ্গিনী। দেন সন্তানসন্ততি। বাঁধেন আত্মীয়তার বাঁধন।

শুধু তাই নয়; তিনি আরো আরো অনেক অনেক বেশি বেশি নেয়ামত দিয়ে থাকেন, যদি আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি আরো বেশি বেশি দিব' *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

এত এত নেয়ামতে ঘিরে রেখেছেন তিনি। এর বিনিময়ে তিনি কী চান? তিনি চান আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা। আসুন! কৃতজ্ঞচিত্তে বলি— আল-হামদুলিল্লাহ।

রামাযানান্তে!

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

কত অর্জনে এ ছওয়াব-বসন্ত তব জীবন রক্তিমে রাঙালো?
তব জীবন দ্বার, এ নব পত্রলেখা কি সাজে সাজালো?
তব জীবন-হাসিরে কি ভূষণে হাসালো?
কত বর্জনে এ শিশির তব জীবন আঙিনা চমকালো?
রহীমের তরে কত রজনি ক্ষমা-পথ চেয়ে জাগিয়াছো?
নীরব নির্জন নিশে একলা কি কিছু চাহিয়াছো?
পাপ-আবরণ, গুনাহ-বন্ধন, তুমি কি ছাড়িয়াছো?
রামাযানান্তে তার ভালোবাসায় গুনাহেরে কি রুধিয়াছো?
সজলঘন আঁখিতে এ মাস পরে ফের কি আধারে কাঁদিয়াছো?
নাকি তব পাপ-সমীরে ফের ফিরিয়াছো?
তব নোংরা আকাশ পানে ফের নাউ বাহিয়াছো?
ক্ষুধিত তৃষিত তব পাপ-কামনা রে কি ফের ফিরায়েছো?
ওযূ জলে, নূর-স্নিগ্ধে কি, পঞ্চ ওয়াক্ত দাঁড়াইয়াছো?
ঈমান মন্থিত অন্তরে কি আজো রহিয়াছো?
রামাযান অন্ত হইয়াছে তব ঈমানী হাসি কি রাখিয়াছো?
এ করুণ করুণা তব জীবন, কি শোভায় সাজালো?
এ রহমত-পবন, তব জীবনে কি ঋতু সাধালো?
এ মাসে আনীত বাণীতে তব সুরে, কি সুর আঁকালো?
এ শুভ্র-বসন্ত, তব জীবনে কোন ফুল ফোটালো?

জীবন স্বপ্ন

-মোস্তফা ইউসুফ আলম
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ।

মুয়াজ্জিনের আযানে ভাঙবে মোদের নিদ,
শয্যা ছেড়ে উঠব মোরা গ্রীষ্ম কিবা শীত।
ছুটে যাব মসজিদ পানে করতে রবের বন্দেগি,
মিথ্যা ছেড়ে সত্য পথে গড়ে তুলব জিন্দেগি।
ভোর বেলাতে পাখপাখালি গায় স্রষ্টার গীত,
তারা একই নিয়ম মেনে চলে গ্রীষ্ম কিবা শীত।
তাই মনের সুখে গাইব মোরা রবের গুণ গীত,
তাঁর গুণগান করব ছেড়ে সব বেহুদা সংগীত।
সাঁঝ সকালে রবের নামে করব শুরু কর্ম,
প্রতি কর্মে রবের স্মরণ এটাই আমার ধর্ম।
সত্য কথা বলব সবাই মিথ্যা কেউ বলব না,
উপদেশ ও নীতিকথা অবহেলায় ঠেলব না।
হালাল পথে করব সবাই বৈধ উপার্জন,
ধরব না কভু অসৎ উপায়ে পরের ধন।
অন্যায় অত্যাচার রুখতে লড়ব আমরণ,
হাসবে মাযলূম ফিরে পেয়ে নূতন জীবন।
সুন্দর সমাজ গড়ব সবাই অসৎ সঙ্গ পায়ে ঠেলে,
ন্যায়ের রাজ করব ক্বায়েম সৎসঙ্গে সবাই মিলে।
ধনী-গরীব, সাদা-কালো বর্ণ ভেদাভেদ গিয়ে ভুলে,
শান্তি সমাজ গড়ব মোরা এক সাথে কাঁধে মিলে।

জ্বলছে ফিলিস্তীন

-মো. সামিউল ইসলাম রাসেল
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

দাবানলের অগ্নিশিখা জ্বলছে ফিলিস্তীনে
ঘূর্ণিঝড়ের বেগ বাড়ছে দিনে দিনে।
নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু পাচ্ছে না কোনো কূল
ঝরনার মতো রক্ত ঝরছে ভেবে পাই না কূল।
কাঁদে আকাশ, কাঁদে বাতাস, কাঁদে অচিন পাখি
শত মায়ের কোল খালিতে অশ্রুসজল আঁখি।
দাঁড়াও দাঁড়াও হে মুসলিম তাদের পাশে দাঁড়াও
ঈমানী শক্তি তাজা রাখতে হাত দুটোকে বাড়াও।

আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন

-নাঈমুল হাসান তানযীম
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

পৃথিবীর পথে পথে হেঁটে চলি রোজ,
কী আছে কোথায় সেটা করি শুধু খোঁজ।
অজানাকে জেনে জেনে বাড়ে বোধ জ্ঞান,
প্রকৃতির প্রেমে পড়ে এই মন-প্রাণ।
কত কিছু আছে আর মহা বিস্ময়,
দিবানিশি ঘুরে ঘুরে তা যে জানা হয়।
পৃথিবীর পথে পথে হেঁটে হেঁটে যাই,
অজানাকে জেনে জেনে তৃষ্ণা মিটাই।

বাংলাদেশ সংবাদ

রামাযানে বিনা লাভে পণ্য বিক্রি করেছেন ওমর ফারুক

সারা বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোতে রামাযান মাস এলে সকল পণ্যের দাম কমে; বাড়ে শুধু বাংলাদেশে। রামাযান এলেই এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী চক্র নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে কৃষক, শ্রমিকসহ নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের কষ্টে দিনযাপন করতে হয়। এসব মানুষের কথা চিন্তা করে রামাযান মাসে লাভ ছাড়াই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করেছেন শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার জয়নগর বাজারের আবদুল্লাহ ভ্যারাইটিজ স্টোরের মালিক ওমর ফারুক নামে এক মুদি দোকানদার। এ মাসে তিনি দোকানের ১২টি পণ্য বিক্রি করছেন বিনা লাভে। ছোলা, চিড়া, চিনি, আখের গুড়, বেসন, মুড়ি, সয়াবিন তেল, লাচ্ছা সেমাই, খোলা সেমাই, কনডেন্স মিল্ক ও খেজুর। এসব পণ্যের মূল্য তালিকা তিনি তার দোকানে সাঁটিয়ে দিয়েছেন। মূল্য তালিকা দেখে কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ হাসিমুখে পণ্য ক্রয় করছেন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর শরীয়তপুরের সহকারী পরিচালক সুজন কাজী তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

৮ বছর ধরে ফ্রি-তে সাহরী ও ইফতার করান রফিক

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরের রফিকুল ইসলম। তিনি ২০১৬ সাল থেকে ৮ বছর ধরে ফ্রি-তে সাহরী এবং ইফতার করান প্রতিদিন প্রায় ১৫০ ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে। বেশি টাকার মালিক না হলেও সারা বছর যা আয় করেন সেখান থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করে রামাযান মাস জুড়ে তিনি সাহরী ও ইফতারের আয়োজন করেন। তিনি বছরের ১১ মাস ব্যবসা করলেও রামাযানের এক মাস আল্লাহর প্রিয় বান্দারের মেহমানদারি করেন। সাহরীতে খাবার থাকে গরুর গোশত, মাছ, ভাজি, ডাল এবং এক গ্লাস দুধ। আর ইফতারিতে থাকে গোশতের বিরিয়ানী, ছোলা বুট, বুন্দা, মুড়ি, পিঁয়াজু, বেগুনি সাথে এক গ্লাস শরবত। তার এ কাজে সহযোগিতা করেন হোটেলের কর্মচারীগণ। তারাও এই মাসে কোনো পারিশ্রমিক নেন না।

আযান দিলেই দোকান খোলা রেখে মসজিদে যান

এটি সঊদী আরব কিংবা আরববিশ্বের কোনো দেশের চিত্র নয়; বাংলাদেশের দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের শান্তির বাজারের মসজিদে আযান হলেই দোকান খোলা রেখেই ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে চলে যান ব্যবসায়ীরা। এখানে দেড়যুগ অধিক সময় ধরে এভাবেই দোকান খোলা রেখে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করেন ওই বাজারের ব্যবসায়ীরা। তবে মালামাল চুরি কিংবা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা অদ্যাবধি ঘটেনি। শান্তির বাজার জামে মসজিদের ইমাম আব্দুল লতিফ বলেন, ‘এখানকার মানুষ সৎ এবং শান্তিপ্রিয়। মসজিদে আযান শোনার সঙ্গে সঙ্গে দোকানিরা বেচাকেনা বন্ধ রেখে দোকান খোলা রেখেই মসজিদে চলে যান। দোকানের মালামাল চুরির ঘটনা আজ অবধি ঘটেনি’।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ফিলিস্তীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত ইউরোপের চারটি দেশ

ফিলিস্তীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হলো ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ। স্পেন, আয়ারল্যান্ড, স্লোভেনিয়া ও মাল্টার নেতারা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গত মাসে ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের এক বৈঠকের পর স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ একথা জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চারটি দেশের নেতারা একমত হয়েছেন ফিলিস্তীনে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের একমাত্র উপায় হলো দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান বাস্তবায়ন করা। চার নেতা স্বাধীন ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইউরোপীয় নেতা মনে করছেন, এই পদক্ষেপের ফলে ইসরাঈল এবং ফিলিস্তীনি রাষ্ট্র পাশাপাশি শান্তি ও নিরাপদে অবস্থান করবে।

ভারতের উত্তর প্রদেশে মাদরাসা বন্ধের নির্দেশ আদালতের

ভারতের জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশে ইসলামিক স্কুল বা মাদরাসাকে বন্ধ ঘোষণা করেছে আদালত। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এতে বলা হয়, উত্তর প্রদেশে মাদরাসা শিক্ষাকে অনুমোদন বা পরিচালনার জন্য একটি আইন করা হয় ২০০৪ সালে। কিন্তু বর্তমানে এক রায়ে আদালত সেই আইন বাতিল ঘোষণা করে। এতে বলা হয়, সাংবিধানিকভাবে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে মাদরাসা প্রচলিত থাকলে তা এই সংবিধানকে লঙ্ঘন করে। এই শিক্ষাকে বাতিল করে শিক্ষার্থীদেরকে প্রচলিত স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেয় আদালত। রাজ্যে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের প্রধান ইফতিখার আহমেদ জাভেদ বলেন, এলাহাবাদ হাই কোর্টের এ রায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ২৭ লাখ শিক্ষার্থী, ১০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ২৫ হাজার মাদরাসা। এ রাজ্যের মোট ২৪ কোটি মানুষের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ হলেন মুসলিম। বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থী এবং বিবেক চৌধুরী তাদের লিখিত রায়ে বলেছেন, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে যাতে ভর্তি থেকে বঞ্চিত না হয় ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুরা তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকে।

মুসলিম বিশ্ব

মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ায় এবার ইসরাঈলি খেজুর বয়কট

সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে, রামাযান মাসে অনেক দেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইসরাঈলি পণ্য বর্জন করছেন। এই তালিকায় এবার যুক্ত হয়েছে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। দেশ দুটির বেশির ভাগ মানুষই ইসরাঈল থেকে আমদানি হওয়া খেজুর কেনা বর্জন করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় এক ব্যক্তিকে ভুল লেবেলে ইসরাঈলের খেজুর বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করেছে দেশটির কাস্টমস বিভাগ। অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম নেতারা দেশটির জনগণকে ইসরাঈলি পণ্য আমদানি বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের ফলে মালয়েশিয়ায় ইসরাঈলি পণ্য বর্জন ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে। ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন অনেক কোম্পানির বিক্রিতে ধস নেমেছে। ইন্দোনেশিয়াতেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ইসরাঈলি খেজুর বর্জনে প্রচারণা চলছে। দেশটির সামাজিক চ্যাট গ্রুপগুলোতে অভিযোগ করা হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ায় ইসরাঈলের খেজুর বেনামে বিক্রি করা হচ্ছে। এসব খেজুর বর্জন করুন। দেশটির অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়বিষয়ক মন্ত্রী আরমিজান মুহাম্মদ আলী বলেন, 'যারা ইসরাঈলি পণ্য বিক্রি করে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা ইন্দোনেশিয়ান কাউন্সিল অব উলামা (এমইউআই) এবং বৃহত্তম মুসলিম গণ সংগঠন নাদহাতুল উলামা ইসরাঈল থেকে আমদানি করা খেজুরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। নাদহাতুল উলামার চেয়ারম্যান আহমেদ ফাহরুর রোজি বলেন, 'ফিলিস্তীনি জনগণের সঙ্গে সংহতি দেখানোর এটাই (ইসরাঈলি পণ্য বর্জন) সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ পথ'।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিশ্বের প্রথম এআই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ডেভিন

ডেভিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তবে সে মানুষ নয়। এআই চালিত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। পেশাগতভাবে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যা যা করতে পারে তার সবটাই করতে পারে সে। বিশ্বের প্রথম এআই চালিত এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে তৈরি করেছে আমেরিকার কগনিশন নামে এক কোম্পানি। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ডেভিন'। ডেভিন কোড তৈরি করতে পারে। ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে। সফটওয়্যারও তৈরি করে দিতে পারে। তাহলে কি এবার ইঞ্জিনিয়াররা চাকরি হারাবে ডেডিনের কারণে? এর জবাবে নির্মাতা কোম্পানি জানিয়েছে, ডেভিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা যা যা পারেন, তা করতে জানলেও কারোর চাকরি নিয়ে টানাটানি করবে না। তাকে তৈরি করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য করার জন্য। তাদের কাজকে আরও সহজ করবে ডেভিন। কিন্তু তার জন্য চাকরি খোয়াতে হবে না কাউকেই।

সালাফী কনফারেন্স-২০২৪

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ৭ ও ৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'সালাফী কনফারেন্স-২০২৪' নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত বীরহাটাব-হাটাবে অবস্থিত আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর সুবিশাল মাঠে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ফালিল্লাহিল হাম্দ। নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর মহাপরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৮ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সে বিপুল সংখ্যক দ্বীনদরদী মুসলিম ভাই-বোনেরা কনফারেন্সে উপস্থিত হন।

১ম দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী নাশীদ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু হয়। কনফারেন্সে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

সালাফী কনফারেন্স ২০২৪-এর এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল— **'আক্বীদা ও মানহাজ'**। আলোচকগণ আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন।

১ম দিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব এর সাবেক উস্তায শায়খ মানসুর ইবনে আব্দুল আজিজ, ভাষান্তর করেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী (ভারত), ড. মঞ্জুর-ই এলাহী, আব্দুর রহমান আল-কারামী, আব্দুল কাদের মাদানী (ভারত), আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, গোলাম রব্বানী, ইসরাফীল বিন তমিজ উদ্দীন প্রমুখ। এছাড়াও প্রথম দিন বাদ এশা আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর বালক শাখার ছাত্ররা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দেয়। উক্ত উনুষ্ঠানে ছাত্রদের শিক্ষণীয়, মননশীল উপস্থাপনায় উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী মুগ্ধ হন। ছাত্রদের উপস্থাপনায় খুশি হয়ে সঊদী আরব থেকে আগত সম্মানিত মেহমানগণ, প্রধান অতিথি, কনফারেন্স-এর সভাপতি ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করেন।

সালাফী কনফারেন্স ২০২৪-এর ২য় দিন বাদ ফজর দারসে কুরআন এর মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। দারসে কুরআন পেশ করেন হাসানুল বান্না মাদান।

নাস্তার বিরতির পর চলে সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব 'আপনার জিজ্ঞাসা'। এ পর্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাঈদুর রহমান এবং উত্তর প্রদান করেন সাঈদুর রহমান রিয়াদী ও আব্দুল বারী বিন সোলায়মান। জুমআর খুৎবা পেশ ও ইমামতি করেন কনফারেন্স-এর সভাপতি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

২য় দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী নাশীদ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়।

এদিনও আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন, পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য পেশ করেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব এর সাবেক উস্তায শায়খ জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে গানেম আল জুহানি, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ড. আবুবকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া, ড. লোকমান হুসাইন, আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম মাদানী, ড. আব্দুল বাছীর বিন নওশাদ, ড. ইমাম হুসাইন, সাইদুর রহমান রিয়াদী, আব্দুল্লাহ মাহমুদ, মাহবূবুর রহমান মাদানী, আব্দুল বারী বিন সুলায়মান প্রমুখ।

কনফারেন্সের ২য় দিন জামি'আহর বালকা শাখার ছাত্রীদের একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা, আরবী ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর ও সাবলীল পরিবেশনা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে চমৎকৃত করে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন তাদের পরিবেশনা।

সালাফী কনফরেন্স-২০২৪-এ বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল বারী বিন সোলায়মান, সাঈদুর রহমান, ফায়সাল আহমেদ প্রমুখ। কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক বস্ত্র ও পাটশিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বর্তমান এমপি গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক)।

প্রকাশনা : এবারের কনফারেন্স এ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুস সালাফ' থেকে 'সিলসিলা ছহীহা' ২য় খণ্ড প্রকাশ হয় এবং 'তুবা পাবলিকেশন' থেকে বহুল প্রতীক্ষিত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক-এর 'মিন্নাতুল বারী' ২য় খণ্ড এবং শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর লেখা 'সদাচরণ' বই প্রকাশ পায়। এছাড়াও আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ থেকে বাংলাদেশে প্রথম আরবী পত্রিকা 'মাজাল্লাতুস সালফ' প্রকাশ পায়। ফালিল্লাহিল হামদ!

সমাপনী বক্তব্য : কনফারেন্সে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দ্বীনী ভাইদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তিনি সকল শ্রোতামণ্ডলীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী, দেশ ও জাতির জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে এবং বৈঠক শেষের দু'আ পাঠের মাধ্যমে ৮ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কনফারেন্স এর আলোচনার বিষয়গুলো দ্রুতই স্মরণিকা আকারে প্রকাশ পাবে ইনশা-আল্লাহ।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): খারেজীরা কি মুসলিম?

-আব্দুল্লাহ মাহমূদ
রাজশাহী।

উত্তর: খারেজীদের আক্বীদা খুবই জঘন্য। রাসূল ﷺ তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৭৩)। তবে তারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত নয়। ছাহাবীগণ তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেননি। বরং তারা তাদের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/২৪৭ পৃ.)। সুতরাং খারেজীদেরকে কাফের বলা যাবে না।

প্রশ্ন (২): জনৈক মুফতী বলেন, মালাকুল মাউতের সাথে তার অধীনে অনেক ফেরেশতা জান কবজ করে। এই কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মো. আরিফুল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: উক্ত বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মালাকুল মাউত হলেন জান কবজের দায়িত্বে প্রধান ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে' (আস-সাজদাহ, ৩২/১১)। আর এই কাজে মালাকুল মাউতকে সহযোগিতাকারী অনেক ফেরেশতা থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশেষে তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমাদের রাসূল (ফেরেশতাগণ) তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না' (আল-আনআম, ৬/৬১)।

প্রশ্ন (৩): কত বছর বয়স থেকে শিশুদের পাপ ও গুনাহ সম্পর্কে লেখা হয়?

-মো. মোস্তফা কামাল
নওগাঁ।

উত্তর: শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হলেই তার ওপর শরীআতের বিধিবিধান বর্তাবে এবং তার পাপ-পুণ্য লেখা হবে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা হলো- ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়; নাবালেগ, যতক্ষণ না সে সাবালক হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না জ্ঞানসম্পন্ন হয়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩)। আর ছেলে শিশুর সাবালক হওয়ার লক্ষণ হলো স্বপ্নদোষ হওয়া, নাভির নিচের লোম উঠা অথবা পনের বছর বয়স হওয়া। আর এগুলোর সাথে মেয়ে শিশুর সাবালক হওয়ার আরেকটি লক্ষণ হলো হায়েয শুরু হওয়া।

প্রশ্ন (৪): পিতা-মাতা যদি যথেষ্ট পরিমাণ নেক আমল না করে মারা যায় তবুও কি সন্তানের দু'আ তাদের জন্য উপকারে আসবে?

-আব্দুল হাসীব
রাজশাহী।

উত্তর: পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দু'আ উপকারে আসার ক্ষেত্রে তাদের নেক আমলের পরিমাণ বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হলো তারা মুসলিম কি-না। যদি মুসলিম হয় এবং সন্তানটি সুসন্তান হয় তাহলে তাদের আমল যত কমই হোক না কেন ঐ সুসন্তানের দু'আ তাদের উপকারে আসবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত। তা হলো- ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, ২. এমন ইলম, যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং ৩. এমন সুসন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১; আবূ দাঊদ, হা/২৮৮০)। কিন্তু পিতা-মাতা যদি অমুসলিম হয়, তাহলে নবী হলেও তার দু'আ তাদের উপকারে আসবে না। যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দু'আ তাঁর পিতার কাজে আসবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৫০)।

প্রশ্ন (৫): কোনো পাগল ব্যক্তি যদি বিষপান করে আত্মহত্যা করে, তাহলে তাকে কি আত্মহত্যার শাস্তি দেওয়া হবে?

-মনিরুল ইসলাম
কুষ্টিয়া।

উত্তর: না, পাগল ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম

www.al-itisam.com

উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা হলো- (১) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়; (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালক শিশু, যতক্ষণ না সে বালেগ হয়' (আবূ দাঊদ হা/৪৪০৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৫১৪)।

প্রশ্ন (৬): একজন কুরআনের হাফেযের পরকালীন প্রতিদান সম্পর্কে জানতে চাই।

-খাইরুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: যেসব হাফেযগণ কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত করে ও সেই অনুযায়ী আমল করে, পরকালে তারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং জান্নাতের উপরের দিকে আরোহণ করতে থাক। অক্ষর ও শব্দ স্পষ্ট করে তেলাওয়াত করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে তেলাওয়াত করতে। তোমার তেলাওয়াতের সর্বশেষ স্তর হবে তোমার বসবাসের সর্বোচ্চ স্থান' (আবূ দাঊদ, হা/১৪৬৪; তিরমিযী, হা/২৯১৪)।

শিরক

প্রশ্ন (৭): কারো প্রতি জিন ভর করলে কবিরাজের নিকট নিয়ে গেলে ঐ ব্যক্তির গলাতে তাবীয ঝুলিয়ে দেয়। প্রশ্ন হলো, এমন অবস্থাতে তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

-মিজানুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর: কোনো অবস্থাতেই তাবীয ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এটা শিরক। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে শিরক করল' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪৪০)। বরং এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছে নির্দেশিত দু'আ দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবে। আউফ ইবনু মালিক আশজাঈ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে (বিভিন্ন) মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতাম। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এক্ষেত্রে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, 'তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করো, ঝাড়ফুঁকে কোনো দোষ নেই, যদি তাতে কোনো শিরক (জাতীয় কথা) না থাকে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০)।

প্রশ্ন (৮): রাশি গণনা করা ও তার প্রতি বিশ্বাস করা কি শরীআতসম্মত?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: রাশি গণনা করা ও তার প্রতি বিশ্বাস করা শিরক। এতে চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না। হাফছা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য ভেবে) তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩০; ছহীহুল জামে, হা/৫৯৪০)।

প্রশ্ন (৯): বিড়াল মেরে ফেললে তার ওযনের সমপরিমাণ লবণ ছাদাক্বা করে তাকে পুঁতে ফেলতে হবে। এ কথা কি ঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এ ধরনের কথা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। তাছাড়া কোনো প্রাণীকে সাধারণত মেরে ফেলা উচিত নয়। জনৈকা মহিলা এক বিড়ালকে আটকে রেখেছিল, তাকে খেতেও দেয়নি, আবার তাকে ছেড়েও দেয়নি যে সে যমীনের পোকামাকড় খাবে। পরে সেই বিড়াল মারা গিয়েছিল। এই কারণে সেই মহিলা জাহান্নামী হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৫)।

বিদআত

প্রশ্ন (১০): আমাদের এলাকায় লায়লাতুল কদরের জন্য রাত জাগার সময় সকলে মিলে খানাপিনার আয়োজন করে। এমনটি করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এই রাতগুলোতে যেকোনো ধরনের খানাপিনার আয়োজন করা কিংবা তাতে সহযোগিতা করা শরীআতসম্মত নয়, বরং এগুলো বিদআত। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (১১): মুনাজাত শেষে মুখমণ্ডল মাসাহ করার পক্ষে কোনো দলীল আছে কি?

-আব্দুল আওয়াল
কুষ্টিয়া।

উত্তর: দু'আ বা মুনাজাত শেষে মুখমণ্ডল মাসাহ করার পক্ষে কোনো ছহীহ দলীল নেই। উক্ত মর্মে বর্ণিত সব হাদীছই যঈফ (আবূ দাঊদ, হা/১৪৮৫)। তাই দু'আ শেষে এমনিতেই হাত ছেড়ে দিতে হবে।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১২): স্বামী স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় পুরুষাঙ্গ হতে কোনো তরল পদার্থ বের হলে গোসল ফরয হবে কি? আর ওই কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাইমুর রহমান
মালয়েশিয়া প্রবাসী।

উত্তর: বীর্যপাত না হয়ে যদি পুরুষাঙ্গ থেকে কোনো তরল পদার্থ বের হয়, তাহলে তাতে গোসল ফরয হবে না, কিন্তু তাতে ওযূ ভঙ্গ হবে। আর কাপড়ে এমন তরল পদার্থ লাগলে সেই স্থান ধৌত করতে হবে। কাপড় থেকে সেই তরল পদার্থ পরিষ্কার না করে সেই কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে না, তবে শুকিয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খুব বেশি মযী নির্গত হতো। এজন্য আমি গোসল করতাম, এমনকি (অত্যধিক গোসলের কারণে) আমার পিঠ ফেটে যেত (ব্যথা অনুভূত হতো)। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিষয়টি অবহিত করলাম কিংবা কেউ তাঁকে বিষয়টি অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'এরূপ করো না। তোমার (লজ্জাস্থানে) মযী দেখতে পেলে তা ধুয়ে নিবে এবং ছালাতের ওযূর মতো ওযূ করবে' (আবূ দাঊদ, হা/২০৬; নাসাঈ, হা/১৯৩)।

প্রশ্ন (১৩): মহিলাদের মাসিক চলা অবস্থায় কি তারা মসজিদে অবস্থান করতে পারবে?

-ফাতেমা খাতুন
বগুড়া।

উত্তর: হ্যাঁ পারবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বললেন, 'হে আয়েশা! আমাকে কাপড়টা এগিয়ে দাও'। তিনি বলেন, আমি যে ঋতুমতী! জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'ঋতু তো তোমার হাতে লাগে নেই'। তারপর আমি তা এনে দিলাম (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯)। এক কালো মহিলা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে মারা গেলে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কবরকে সামনে করে তার জানাযার ছালাত আদায় করেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৫৬)।

ছালাত

প্রশ্ন (১৪): আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত পড়ার পৃথক কোনো ফযীলত আছে কি?

-মাসুদ রানা
নাটোর।

উত্তর: আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। উম্মু ফারওয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (আবূ দাঊদ হা/৪২৬)।

প্রশ্ন (১৫): ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান কী?

-আতাউর রহমান
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: ছালাত সরবে হোক বা নিরবে হোক, একাকী হোক বা জামাআতবদ্ধ হোক সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক। কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হবে না। উবাদা ইবনু ছামেত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার ছালাত হবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৪)।

প্রশ্ন (১৬): আমার নাইটগার্ডের কাজ রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। এর মাঝে এশা ও ফজরের ছালাত জামাআতে আদায় করা সম্ভব নয়। বরং যেখানে ডিউটি সেখানেই ছালাত আদায় করতে হবে। সেক্ষেত্রে কি এই কাজ করা আমার জন্য বৈধ হবে?

-নাজিম
রাজশাহী।

উত্তর: জামাআতে ছালাত আদায় করা আবশ্যক। যারা জামাআত থেকে পিছিয়ে থাকে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪)। সুতরাং শারঈ কোনো ওযর ব্যতীত জামাআত ত্যাগ করা যাবে না, বরং অবশ্যই জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করতে হবে। তবে বিশেষ কারণে জামাআতে না যেতে পারলে স্বস্থানে ছালাত আদায় করবে। যেমন গার্ডের ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে।

কেননা কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাপড় যদি (চুরি করে) নিয়ে যাওয়া হয়, তবে ছালাত ছেড়ে দিয়ে চোরকে (ধরার জন্য তার) অনুসরণ করবে (ছহীহ বুখারী, ২/৬৪)। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি তার স্বস্থানে এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন (১৭) : ছোট শিশুদেরকে মসজিদে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করার সময় নিয়ে আসা যাবে কি?

-আব্দুস সামাদ
রাজশাহী।

উত্তর: ছোট শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়াতে কোনো বাধা নেই। আবূ কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইমামতি করতে দেখেছি। এমতাবস্থায় নাতনী উমামা বিনতু আবূল আছ তাঁর কাঁধে থাকত। তিনি যখন রুকূতে যেতেন উমামাকে নিচে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাতেন, তখন তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৪৩)। তবে ছোট বাচ্চাদেরকে সম্ভবপর শান্ত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদেরকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১৮): কোনো ছালাত আদায়কারীর সামনে যদি সুতরা না থাকে এবং তার সামনে দিয়ে কোনো মানুষ অতিক্রম করলে কি তার ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে? অনেকে বলে, নষ্ট হয়ে যাবে; অনেকে বলে, নষ্ট হয়ে যাবে না। সঠিকটা জানতে চাই?

-আব্দুল আহাদ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: ছালাতে সুতরা গ্রহণ করা সুন্নাত (আবূ দাঊদ, হা/৬৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/৯৫৪)। সুতরাং প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত হবে ছালাতের জন্য সুতরা গ্রহণ করা। তবে ছালাত আদায়কারী যদি সুতরা গ্রহণ না করে, তাহলে উক্ত অবস্থায় তার সিজদার জায়গা থেকে এক ছাগল চলাচলের জায়গা বাদ দিয়ে তৎপরবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করা যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৮)। পক্ষান্তরে এই দূরত্বের মধ্য দিয়ে পার হওয়া জায়েয নয়। তারপরও কোনো ব্যক্তি যদি পার হয় তবুও ছালাত ভঙ্গ হবে না। তবে যে ব্যক্তি পার হবে সে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (১৯): ছালাতে তাওয়াররুক করা কি শুধু তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতের জন্যই নির্দিষ্ট?

-সাখাওয়াত হোসেন মাহিম
গাজীপুর।

উত্তর: না, ছালাতে তাওয়াররুক করা শুধু তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতের জন্য নয়; বরং সকল ছালাতেরই যেই তাশাহহুদে সালাম রয়েছে, সেখানে তাওয়াররুক করে বসবে, যদিও সেটি দুই রাকআত বা এক রাকআত বিশিষ্ট ছালাত হোক না কেন। কেননা আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাকআতে বসতেন তখন বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৮২৮; আবূ দাঊদ, হা/৭৩০)। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ছালাত যদি দুই রাকআত বিশিষ্ট হয়, তাহলে তাশাহহুদে তাওয়াররুক করেই বসবে (আল-মাজমূ, ৩/৪৩১)।

প্রশ্ন (২০): আমার দাঁড়াতে কষ্ট হলেও আমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারব। কিন্তু শারীরিকভাবে অসুস্থতার আশঙ্কা করে চিকিৎসক দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-মতিউর রহমান
নওগাঁ।

উত্তর: ফরয ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা আবশ্যক। কেউ সক্ষমতা থাকার পরেও দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় না করলে তার ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও’ (আল-বাকারা, ২/২৩৮)। ইমরান বিন হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছালাত সম্পর্কে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ‘দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো। যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে ছালাত আদায় করো’ (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭)। তবে কোনো মুসলিম বিশ্বস্ত চিকিৎসক যদি স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশঙ্কা করে বসে ছালাত আদায় করতে বলেন, তাহলে বসে ছালাত আদায় করাতে কোনো বাধা নেই (শারহুল মুমতে, ৪/৪৬১)।

প্রশ্ন (২১): ছালাতে প্রথম তাশাহহুদ ছুটে গেলে কেবল সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে কি?

-তানভীর
ঢাকা।

উত্তর: প্রথম তাশাহহুদ ছুটে গেলে সালামের পূর্বে সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে। আব্দুল্লাহ বিন বুহায়না (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের ছালাতে দুই রাকআত পর না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সালামের পূর্বে দুটি সহো সিজদা দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২২৫; ইবনু মাজাহ, হা/১২০৬)।

প্রশ্ন (২২): আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যদি কোনো মসজিদের কিবলা ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই মসজিদে ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?

-মো. হুযায়ফা
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: কা'বা থেকে দূরবর্তীদের জন্য কা'বা যেই দিকে আছে সেই দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করলেই তা যথেষ্ট হবে (আল-বাকারা, ২/১৪৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা অবস্থিত' (তিরমিযী, হা/৩৪২, ইবনু মাজাহ, হা/১০১১)। সুতরাং কিবলা যেই দিকে রয়েছে মুছল্লী যদি সেই দিকে ফিরে ছালাত আদায় করে, তাহলে সেই ছালাত সঠিক হবে, যদিও তা সরাসরি কিবলার বরাবর না হয়। তবে সম্ভবপর মসজিদের কাতারগুলো কিবলা বরাবর সোজা করে নেওয়া কর্তব্য, যদিও দেখতে অসুন্দর দেখায়।

প্রশ্ন (২৩): 'পুরো দুনিয়াই মসজিদ'- হাদীছটি কি ছহীহ? আর পুরো দুনিয়া যদি মসজিদ হয়ে থাকে তাহলে আলাদাভাবে মসজিদ নির্মাণ করা হলো কেন? পুরো দুনিয়াই মসজিদ হাদীছটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

-মুত্তাকিন আহমেদ
পিরিজপুর।

উত্তর: উক্ত হাদীছটি ছহীহ (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২১)। আহলে কিতাবরা শুধু তাদের ধর্মশালাতেই ইবাদত করাকে বৈধ মনে করত। কিন্তু এই হাদীছ দিয়ে এই উম্মতের জন্য হালকা করা হয়েছে যে, ছালাতের ওয়াক্ত হলে তারা যেখানেই থাকুক সেখানেই ছালাত আদায় করতে পারবে (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৯/৩৬৭৫)।

জানাযা

প্রশ্ন (২৪): জানাযার ছালাতে পায়ের সাথে পা মিলাতে হবে কি?

-আব্দুর রাজ্জাক
রাজশাহী।

উত্তর: জানাযার ছালাতে পায়ের সাথে পা মিল করেই দাঁড়াতে হবে। কারণ এটাও ছালাত। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাজ্জাশীর জানাযায় সারিবদ্ধ হন এবং চার তাকবীরে জানাযা পড়ান (ছহীহ বুখারী, হা/১২৪৫)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, আমরা জনৈক ব্যক্তির জানাযায় রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম (ছহীহ বুখারী, হা/১৩২১)।

প্রশ্ন (২৫): মহিলা ও পুরুষের জানাযার ছালাতে ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন?

-আবূ তালেব
রংপুর।

উত্তর: জানাযার ছালাতে ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর এবং মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়াবে। নাফি' আবূ গালিব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর সাথে এক জানাযায় (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর) ছালাত আদায় করেছি। তিনি (জানাযার) মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। এরপর লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আবূ হামযা! এই মহিলার জানাযার ছালাত আদায় করে দিন। (এ কথা শুনে) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) খাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাযার ছালাত আদায় করে দিলেন। এটা দেখে আলা ইবনু যিয়াদ বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এভাবে দাঁড়িয়ে জানাযার ছালাত আদায় করতে দেখেছেন, যেভাবে আপনি এ মহিলার ছালাত মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও পুরুষটির জানাযা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ালেন? আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, হ্যাঁ দেখেছি (তিরমিযী, হা/১০৩৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৪৯৪; নাসাঈ, হা/১৯৭৯)।

যাকাত

প্রশ্ন (২৬): ঋণগ্রস্ত পিতাকে যাকাত দেওয়া যাবে কি?

-তাহাজুল ইসলাম
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: ঋণগ্রস্ত পিতাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। বরং সন্তানের জন্য আবশ্যক হবে নিজের সম্পদ থেকে পিতার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা। আর পিতামাতাসহ যাদের ভরণপোষণ দেওয়া ফরয, তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয় (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০০)। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার' (ইবনু মাজাহ, হা/২২৯১; আল-ইরওয়া, হা/৮৩৮)।

প্রশ্ন (২৭): ভাগা জমিতে উৎপাদিত ফসলের উশর কে দিবে? জমির মালিক নাকি কৃষক যিনি ভাগা নিয়েছেন?

-মাকবূল হোসেন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: ভাগা কিংবা আধি পদ্ধতিতে জমি আবাদ করা হলে সেই জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত তথা উশর মালিক ও চাষী উভয়কেই দিতে হবে, যদি উভয়ের অংশ নিছাব পরিমাণ (১৮ মণ ৩০ কেজি) হয়। তবে যদি কারও অংশই নিছাব পরিমাণ না হয়, তাহলে কাউকেই যাকাত দিতে হবে না (আল-মুগনী, ৫/৩০৪)।

প্রশ্ন (২৮): একজন নাবালকের কিছু সম্পদ আছে। সে যদি মসজিদ বা ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো কাজে সেই সম্পদ দিতে চায়, তাহলে সেটা কি গ্রহণ করা যাবে?

-রাকিবুল ইসলাম
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: সেই নাবালক সন্তান যদি এমন হয় যে, সে ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে, তাহলে এমন সন্তান মসজিদ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করলে তা গ্রহণ করা যাবে (আল-মুগনী, ৪/১৬৮)। আর সেই নাবালক সন্তান যদি এমন হয় যে, সে ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না, তাহলে তার থেকে সম্পদ গ্রহণ করা যাবে না (আন-নিসা, ৪/৫)। আর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে- (১) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়; (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালক শিশু, যতক্ষণ না সে বালেগ হয়' (আবূ দাঊদ হা/৪৪০৩; ছহীহুল জামে', হা/৩৫১৪)।

বিবাহ

প্রশ্ন (২৯): ৫০ বছর আগে ৫ হাজার টাকা বাকি মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করি। এখন আমি মোহর পরিশোধ করতে চাচ্ছি। তাহলে ৫ হাজার টাকা পরিশোধ করাই যথেষ্ট হবে, নাকি বাজার মূল্য ধরে স্বর্ণ কিংবা জমি-জায়গা দিয়ে মোহর পরিশোধ করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: বিবাহের সময়ই মোহর পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা নগদে মোহর দিয়ে বিবাহ করাই উত্তম (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২৫)। তারপরও কেউ যদি বাকিতে মোহর রেখে বিবাহ করে পরবর্তীতে পরিশোধ করতে চায়, তাহলে বিবাহের সময় নির্ধারিত মোহর দিলেই তা আদায় হবে, বর্তমান বাজার মূল্যে নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি মোহর বাবদ ৫ হাজার টাকা পরিশোধ করলেই তা যথেষ্ট হবে, ইনশা-আল্লাহ। তবে খুশিমনে চাইলে বেশি দিতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৯০)।

প্রশ্ন (৩০): আমার ফুফু মারা যাওয়ায় আমার দাদী ফুফাতো ভাইকে দুধ খাইয়েছেন, তাহলে তো দুধের সম্পর্কে আমার বাবা আর ফুফাতো ভাই একে অপরের ভাই হয়ে যায়। এখন ওই ফুফাতো ভাইয়ের সাথে কি আমার বোনের বিয়ে দিতে পারব?

-আফসানা আক্তার আশা
কেরানীগঞ্জ।

উত্তর: শিশুর বয়স দুই বছরের মধ্যে যদি দুধ পান করিয়ে থাকে, তাহলে দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে, বিধায় তার সাথে বিবাহ দেওয়া যাবে না। কেননা এতে নিজের দুধ ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা হারাম (আন-নিসা, ৪/২৩)। আর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দুধপানের সম্পর্ক দ্বারা ঐসব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৫)।

প্রশ্ন (৩১): স্বামী ব্যতীত স্ত্রী বাবার বাড়ি কতদিন থাকতে পারবে?

-ফরিদ আহম্মেদ
ময়মনসিংহ।

উত্তর: এই বিষয়ে শরীআতে নির্দিষ্ট কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বরং জরুরী প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী স্ত্রী বাবার বাড়িতে থাকতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর উপর অপবাদের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীছে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলেন যে, আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪১৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৭০)। সেখানে তিনি প্রায় একমাস ছিলেন। তবে তিনদিনের পরে খাওয়া খরচ দেওয়া ভালো।

প্রশ্ন (৩২): আমি বিবাহ করার সাত দিন পরেই পড়াশুনার জন্য দেশের বাইরে চলে যাই। এই সাত দিনের মধ্যে আমাদের কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। কিছুদিন আগে ফোনে ঝগড়ার এক পর্যায়ে প্রচণ্ড রাগে কোনো কিছু না ভেবেই আমি তাকে বলে ফেলি, তোকে তালাক দিলাম এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। এর কিছুক্ষণ পর আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। আমি তওবা করে আমার কথা ফিরিয়ে নিই। আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনই একে অপরকে অনেক ভালোবাসি। আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ চাচ্ছি না। আমাদের জন্য কুরআন হাদীছের আলোকে সমাধান দিয়ে সহায়তা করুন।

-খালেদ মাহমুদ
যুক্তরাষ্ট্র।

উত্তর: যেহেতু সহবাস করার আগেই তালাক হয়েছে, সেহেতু স্ত্রীকে সেই বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে না এবং স্ত্রীকেও কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে’ (আল-আহযাব, ৩৩/৪৯)। এখন যদি সেই মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়, তাহলে আবার মোহর দিয়ে নতুনভাবে বিবাহ করার মাধ্যমে স্ত্রী হিসেবে নিতে পারে (আল-মুগনী, ৭/৩৯৭)।

প্রশ্ন (৩৩): আমি বেশি সন্তান নিতে চাই। কিন্তু আমার স্ত্রী সন্তান নিতে চায় না। এই অবস্থায় কি আমি তাকে বাধ্য করতে পারব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: বেশি বেশি সন্তান নেওয়া বিবাহের অন্যতম একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মাকিল ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা বিবাহ করো স্বামীভক্তি ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণীকে। কেননা (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গর্ব অন্যান্য উম্মতের উপর বিজয় প্রকাশ করতে চাই’ (আবূ দাঊদ, হা/২০৫০, নাসাঈ, হা/৩২২৭)। এক্ষণে স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত ক্ষতির কারণ না থাকলে স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তান নিতে বাধ্য করতে পারবেন।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৪): কোনো মেয়ে পূর্ণ পর্দার বিধান পালন করে তার স্বামীর সাথে গার্মেন্টসের ব্যবসা করতে পারবে কি?

-মো. মাসুদ রানা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা মেয়েদেরকে উপার্জন করার দায়িত্ব দেননি। বরং উপার্জনের দায়িত্ব হলো পুরুষের ওপর। আর মেয়েদের উচিত হলো, বাড়িতে অবস্থান করা ও বাড়ির অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না’ (আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)। তারপরও যদি উপার্জনের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে যদি পূর্ণ পর্দা করার ব্যবস্থা থাকে, ব্যবসা শরীআতসম্মত হয় এবং পুরুষের সমাগম থেকে মুক্ত হয়, তাহলে এমন স্থানে ব্যবসা করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। তবে ব্যবসায় স্বামীকে স্ত্রীর সহযোগিতা করাটা কিয়ামতের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন (মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৭২৩৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৮৭০)।

প্রশ্ন (৩৫): আমার পিতা একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, তার বেতন বহির্ভূত ঘুষের অর্থও ছিল। তিনি এখন মৃত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার রেখে যাওয়া সকল সম্পদের মালিক কি উত্তরাধিকারী হিসাবে তার স্ত্রী-সন্তানেরা পাবে? এবং পেলে তা কি স্ত্রী-সন্তানের জন্য গ্রহণ করা হালাল হবে? এবং উক্ত সম্পদ ব্যবহার করে স্ত্রী-পুত্রগণ ব্যবসা করলে সেই ব্যবসা কি হালাল হবে?

-রাকিব
কুড়িগ্রাম।

উত্তর: প্রথমত, ইসলামী শরীআতে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই হারাম। রাসূল ﷺ ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর লা'নত করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০; তিরমিযী, হা/১৩৩৭)। দ্বিতীয়ত, এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদগুলো তার সকল ওয়ারিছদের মাঝেই বণ্টন করা হবে এবং সেই সম্পদ তখন তার ওয়ারিছদের জন্য হালাল হয়ে যাবে (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ২৯/৩০৭; লিকাউল বাবিল মাফতুল, ইবনু উছায়মীন, ১০/২৮)। এমতাবস্থায় তার সম্পদের কিছু অংশ দান করা ভালো হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ ও মিথ্যা এসে যায়। তাই কিছু দান-খয়রাত করে তা পরিচ্ছন্ন করে নিও' (ইবনু মাজাহ, হা/২১৪৫; নাসাঈ, হা/১২০৮)।

প্রশ্ন (৩৬): হিন্দুদের পূজার খাবার খাওয়া কি জায়েয? যেমন লাড়ু, মিষ্টি, মোয়া ইত্যাদি।

-আসিফ আব্দুল্লাহ
নাটোর।

উত্তর: কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের উদ্দেশ্যে তৈরি করা খাবার খাওয়া জায়েয নয়। এমনকি তাদের ধর্মীয় উৎসবের উদ্দেশ্যে তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করাও জায়েয নয়। কেননা এর মাধ্যমে তাদেরকে সম্মান করা হয়, তাদের শিরকী কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা নিষিদ্ধ (আল-মায়েদা, ৫/২)। তাছাড়া এর মাধ্যমে তাদের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য অভিযোগ কায়েম করতে চাও' (আন-নিসা, ৪/১৪৪)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ; অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে' (আল-মুমতাহিনা, ৬০/১)। সুতরাং কোনো মুসলিমের জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের উদ্দেশ্যে তৈরি করা খাবার খাওয়া জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৭): জনৈক আহলেহাদীছ বক্তা বলেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, দাড়ি সাদা রাখা যাবে না, মেহেদী দিয়ে রং করতে হবে। সাদা দাড়ি নাকি এটা ইয়াহূদীদের বৈশিষ্ট্য। এটি কতটুকু সত্য?

-শাহরিয়ার নাফিজ
কুমিল্লা।

উত্তর: সাদা দাড়িকে মেহেদী বা অন্য রং দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু কালো রং করা হারাম। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পিতা আবূ কুহাফাকে নবী ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সে সময় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সুগামার (কাশফুলের) মতো একেবারে সাদা ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'কোনো কিছুর দ্বারা তার চুল দাড়ির শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং থেকে বিরত থাকবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০২; আবূ দাঊদ, হা/৪২০৪)। আর সাদা চুলে খিযাব না করা ইয়াহূদী, নাছারার বৈশিষ্ট্য। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ইয়াহূদী ও নাছারা (দাড়ি-চুলে) রং লাগায় না। অতএব, তোমরা তাদের বিপরীত কাজ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬২, ৫৮৯৯)।

প্রশ্ন (৩৮): কারো নাম আব্দুল আলী রাখা যাবে?

-আব্দুল আলী
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর: আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম হলো আলী বা সুউচ্চ (আল-বাকারা, ২/২৫৫; সাবা, ৩৪/২৩)। এই নামের দিকে সম্পৃক্ত করে কারো নাম আব্দুল আলী রাখাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কেউ যদি আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর দিকে সম্পৃক্ত করে আব্দুল আলী নাম রাখে, তাহলে তা জায়েয হবে না; বরং তা শিরক বলে গণ্য হবে।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৯): গার্ডিয়ান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে জীবনবীমা করা কি জায়েয? ইসলামে জীবনবীমা সম্পর্কে কী বিধান আছে?

-মুহাম্মাদ ফাহিম হাসান
ঢাকা।

উত্তর: প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার কোনোটিই বৈধ নয়। কেননা প্রথমত, এখানে দাতাপক্ষের টাকা নিয়ে দ্বিগুণ বিনিময় দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিনিয়োগকারী পক্ষ লাভবান হয়। কিন্তু যদি বিনিয়োগকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে দাতাপক্ষের সমস্ত টাকাই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা এক প্রকার জুয়ার শামিল। আর ইসলামে জুয়াখেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও কবীরা গুনাহ (আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৭)। দ্বিতীয়ত, এটি একটি সূদভিত্তিক লেনদেন। কেননা একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দাতাপক্ষ তার প্রদেয় টাকার দ্বিগুণ গ্রহণ করে থাকে, যা নিঃসন্দেহে হারাম (আল-বাকারা, ২/২৭৫-২৭৬; ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১৭৬)। তৃতীয়ত, এটি এক প্রকার ধোঁকা, কেননা দাতাপক্ষকে কী পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে তা সাধারণত তাকে জানানো হয় না। তাই এটা একটি অনির্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্তির চুক্তি, যা নিষিদ্ধ (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৮১; আবূ দাঊদ, হা/৩৩৭৮)। চতুর্থত, জীবনবীমার মাধ্যমে অন্য পরিবারের যে ভার বহনের দায়িত্ব নেওয়া হয়, এমনটি শারঈ বিধান নয়। কেননা সে পরিবার কীভাবে চলবে তা আল্লাহর যিম্মাদারীতে রয়েছে।

প্রশ্ন (৪০): ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা করা কতটুকু জায়েয?

-মুজিবুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর: নিরুপায় অবস্থা ছাড়া ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূল ﷺ প্রত্যেক ছালাতে সর্বদাই ঋণ থেকে আশ্রয় চাইতেন (নাসাঈ, হা/৫৪৮৭)। আর ইসলামী ব্যাংকসহ কোনো ব্যাংকই শতভাগ সূদ থেকে মুক্ত নয়। আর জেনেশুনে কোনো মুসলিমের জন্য সূদের কারবারিতে জড়িয়ে পড়া হারাম। কেননা আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। আর রাসূল ﷺ সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদের উপর অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকসহ যেকোনো ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৪১): কোনো একটি বাড়ি ছয় লক্ষ টাকা লিখিত চুক্তি সাপেক্ষে তিন বছরের জন্য বন্ধক রাখলে, তিন বছর শেষে পুনরায় মালিক ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে মালিকানা ফেরত নিলে কি তা বৈধ হবে?

-মো. জাকির হোসেন
কুয়েত।

উত্তর: ইসলামী শরীআতে কোনো কিছু বন্ধক রাখা বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু নিজের দখলে রাখবে’ (আল-বাকারা, ২/২৮৩)। নবী ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৩)। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, যার নিকট কোনো কিছু বন্ধক রাখা হবে সেই বন্ধক রাখা বস্তু থেকে উপকৃত হতে পারবে না (আল-মুগনী, ৪/২৮৯)। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বাড়ি বন্ধক রাখা যাবে, তবে শর্ত হলো যার নিকট বন্ধক রাখা হবে সে ব্যক্তি সেই বাড়িতে নিজে অবস্থান করতে পারবে না বা অন্যকে ভাড়াও দিতে পারবে না। যদি ভাড়া দেয়, তাহলে ভাড়া থেকে প্রাপ্ত টাকা মূল মালিককে দিতে হবে। মূল মালিককে না দিয়ে যদি নিজে উপকৃত হয়, তাহলে তা সূদ বলে গণ্য হবে, যা নিষিদ্ধ (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/২১৯৩৭)।

প্রশ্ন (৪২): আমাদের গ্রামে এমন কোনো কবরস্থান নেই, যেখানে গ্রামের সকল মুসলমানকে কবর দেওয়া যায়। বরং প্রতিটি বংশের আলাদা আলাদা কবরস্থান রয়েছে। আমাদের কোনো কবরস্থান ছিল না, তাই আমার বাবা ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলেন যে, আমাকে এখানে কবর দিও এবং এখানে দশ শতক জমি কবরস্থানের জন্য বাদ দিয়ে বাকি জমিগুলো তোমরা ভাগ করে নিও। বাবা ইন্তেকালের পরে আমরা তাই করেছি। এই দশ শতক

জমিতে শুধুমাত্র বাবার কবর রয়েছে, বাকি জমিটা খালি পড়ে ছিল। তাই জমিটা খালি ফেলে না রেখে, আমি চাষ করছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, আমার এই চাষ করাটা ইসলামী শরীআত মতে জায়েয হচ্ছে কি?

-যয়নুল আবেদীন
উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তর: পিতার অছিয়ত অনুযায়ী উক্ত জমিটি কবরস্থানের জন্য ওয়াকফ হয়ে গেছে। তাই এখানে চাষাবাদ করা হলে, উক্ত এলাকায় প্রচলিত লিজ বা বর্গা অনুযায়ী চাষকারী তার অংশ গ্রহণ করবে আর বাকি অংশ কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩২)। আর সেই কবরস্থানের প্রয়োজন না থাকলে অন্য কবরস্থানের উন্নয়নে সেই অর্থ দিয়ে দিবে।

প্রশ্ন (৪৩): অন্যের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে অর্জন করা সার্টিফিকেট দ্বারা চাকরি করলে তা হালাল হবে কি?

-আব্দুর রশীদ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: না, হালাল হবে না। কেননা এটা চুরি, প্রতারণা ও ধোঁকার শামিল। যা স্পষ্ট হারাম। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ধোঁকা দিবে সে আমার দলভুক্ত নয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২; ইবনু মাজাহ, হা/২২২৫)। এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এসব সার্টিফিকেট দ্বারা চাকরির উপার্জিত পয়সা হালাল হবে না।

প্রশ্ন (৪৪): দাঁড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা কী?

-মামুন ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর: বসে পেশাব করাই সুন্নাত (তিরমিযী, হা/১২; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭; নাসাঈ, হা/২৯)। তবে বাধ্যগত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে। হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা গোত্রের ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে আসলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি আনতে বললেন। আমি তাঁকে পানি এনে দিলে তিনি ওযূ করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৩)।

প্রশ্ন (৪৫): মোবাইল ব্যবসা কি হালাল হবে? কারণ মোবাইল বিভিন্ন ধর্মের লোক এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষ ক্রয় করে। সাধারণত বর্তমান পরিস্থিতিকে লক্ষ্য রেখে বুঝা যায় যে, তারা খারাপ কাজেও মোবাইল ব্যবহার করবে বা খারাপ কাজে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে আমার ব্যবসা টা কি জায়েয হবে?

-তোফিজুল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর: মোবাইলের ব্যবসা করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। তবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তি এই মোবাইল নিয়ে পাপের কাজে ব্যবহার করবে, তাহলে তার কাছে মোবাইল বিক্রি করা যাবে না। কেননা এতে করে তার পাপকাজে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। তবে সাধারণত অধিকাংশ মানুষই মোবাইল খারাপ কাজে ব্যবহার করে। তাই তাক্বওয়ার দাবি অনুযায়ী এমন ব্যবসা থেকে বিরত থাকাই ভালো (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২০৭৫)।

প্রশ্ন (৪৬): আমি একজন ব্যবসায়ীর ম্যানেজার হিসেবে কাজ করি। তার ব্যবসার সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখি। বর্তমানে তিনি কিছু টাকা সূদে লোন নিয়েছেন। সূদ নেওয়া বা তার লাভ দেওয়ার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমি যেহেতু তার ব্যবসার সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখি, তাই তিনি যে তারিখে সূদের লাভ দেন সেই তারিখে সূদের লাভের ব্যয় হিসেবে আমাকে খাতায় লিখে রাখতে হয়। আমি সূদের লাভ উল্লেখ না করে অন্যান্য বাবদ লিখে খরচটা দেখাই। এতে কি আমি সূদের লেখক হিসেবে পরিগণিত হব? আমার চাকরিটা হালাল না হলে, আমি দ্রুত ছেড়ে দিতে চাই।

-খালেদ সাইফুল্লাহ
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর: এমন কাজ করা বৈধ নয়। কেননা এতে সূদের কারবারে সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। আর হাদীছে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের ওপর লা‘নত করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৭)। এখানে সূদের লেখক বলতে সূদদাতা ও গ্রহীতার মাঝে সূদের কারবারের লেখক উদ্দেশ্য (শারহু মুসলিম, নববী, ১১/২৬; মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/১৯১৬)। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি এমন কাজ করার কারণে সূদের লেখক হিসেবে গণ্য হবে না, ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন (৪৭): মহিউদ্দীন এর অর্থ কী? শুধু মহিউদ্দীন রাখা যাবে কি?

-মহিউদ্দীন
কুনিয়া, গাজীপুর।

উত্তর: মুহিউদ্দীন শব্দের অর্থ হলো, দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিতকারী। আর এমন নাম রাখাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৪৮): সরকারি বা খাস জায়গাতে বা রাস্তার খাদে, নদীর চরে চাষাবাদ করে ভোগ করার বিধান কী? একজন মুমিন ব্যক্তি কি খাস জমি চাষাবাদ করে ভোগ করতে পারবে?

-মো. শামসুল আরেফীন
নাটোর।

উত্তর: এমন জমি চাষাবাদ করাতে যদি সরকারিভাবে কোনো বাধা বা নিষেধ না থাকে, তাহলে সেগুলো চাষাবাদ করাতে কোনো বাধা নেই। সাঈদ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘কেউ কোনো পতিত জমি আবাদ করলে সেটা তারই’ (আবূ দাঊদ, হা/৩০৭৩; তিরমিযী, হা/১৪০৭)।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪৯): আমরা তিন ভাই, দুই বোন। বড় ভাই এবং বোনদের বিয়ে হয়েছে। আর আমি ও আমার ছোট ভাই মাদরাসায় পড়ি। আমাদের বাড়ি-ভিটা ছাড়া একটি চাষের জমি আছে, যেটা আমাদের পরিবারের আয়ের উৎস। এমতাবস্থায় আমার বড় ভাই সেই জমিতে তার ওয়ারিছের অংশ নিয়ে বাড়ি বানাতে চায়। আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত জমি কি সে এখনই ওয়ারিছ হিসেবে পাওয়ার অধিকার রাখে? কেননা আমার বাবা-মা জীবিত আছেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মুবিন
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর: এখন বণ্টন হবে না। তবে কোনো মানুষ তার সন্তানকে স্থায়ী কিছু অর্থসম্পদ দিতে চাইলে অংশ হারে দিতে হবে, বিশেষ কোনো একজনকে দেওয়া যাবে না। নু‘মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ?’ তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো’। নু‘মান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)।

প্রশ্ন (৫০): আমার দাদা যখন মারা যায়, তখন আমার দাদির একটা ছেলে ছিল। তারপর আমার দাদি অন্যত্র বিবাহ করে, সেখানে তার দুইটি ছেলে হয়। এখন আমার দাদির মৃত্যুর পরে সম্পদ কয়ভাবে ভাগ করতে হবে? কারণ পরের দুই সন্তান মনে করছে যে, আগের ছেলে কোনো সম্পদ পাবে না। দয়া করে বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।

-মো. হাফিজ উদ্দিন
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: মীরাছের ক্ষেত্রে সর্বদাই মৃতের দিকে সম্পৃক্ত করে ওয়ারিছদের অংশ নির্ধারিত হয়। এখানে যেহেতু তিন সন্তানই সেই মহিলার নিজের সন্তান, তাই এই তিন সন্তানই মহিলার সম্পদের ওয়ারিছ হবে (আন-নিসা, ৪/১১)। সুতরাং এমতাবস্থায় আছাবা হিসেবে তিন সন্তানের মাঝেই সমান ভাগে সম্পদ ভাগ করে দিতে হবে।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর সার্বিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিন!

আস-সালামু আলাইকুম

সম্মানিত সুধী! আপনারা অবগত আছেন, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (নিবন্ধন নং s-12288-2016) দেশব্যাপী শিক্ষা, সেবা ও দাওয়াহ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, আল-হামদুলিল্লাহ!

শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের চারটি জেলায় 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে যেখানে ৪৭১০ জন শিক্ষার্থী (যাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জন ইয়াতীম), ২২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রায় ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

বর্তমানে রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ শাখায় আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমি ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৬০ বিঘা জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, এখনো ৩০০ শতক জমি (প্রায় তিন লক্ষ টাকা শতক হারে) ক্রয় করতে হবে। অত্র শাখায় দেশের বৃহত্তম বায়তুল হামদ জামে মসজিদের কাজ চলমান, যার পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ! মসজিদটির প্রতি তলায় সাত হাজার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। বর্তমানে নিবরাস মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তানোর-গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে ৬০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে বর্তমানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ এর অধীনে দেশব্যাপী মসজিদভিত্তিক দ্বীন শিক্ষা প্রকল্প চলমান, যার অধীনে ইতোমধ্যে ৩০০ এর অধিক মক্তব চালু রয়েছে। ফ্রি মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সিলেবাস বিতরণ চলমান রয়েছে। এছাড়াও মাসিক আল-ইতিছামসহ বিভিন্ন বই ফ্রি বিতরণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

উপরিউক্ত মহতী কাজগুলো এগিয়ে নিতে দ্বীনী ভাই-বোনদের সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সার্বিক সহযোগিতা কবুল করুন- আমীন!

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন;
মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

Monthly Al-Itisam الاعتصام 8th Year, 7th Part, May 2024, Price : 30.00

মাকতাবাতুস সালাফ
কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

সিলসিলা ছহীহা!
(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)

২য় খণ্ড

সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিকহী ধারায় বিন্যস্ত

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

পৃষ্ঠা : ৪৮০ | মূল্য : ৫৮০/-

উছমানী ক্বায়েদা
উছমান ইবনে আফফান কুরআন গবেষণা কেন্দ্র

ফিকহুস সালাফ
(আহলুল হাদীছ ও সালাফী মানহাজের ফিকহ)

১ম খণ্ড

আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

পৃষ্ঠা : ৪৪৮ | মূল্য : ৫০০/-

কিতাবুদ-দাওয়াহ

আদর্শ শিক্ষা
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

পৃষ্ঠা : ৬০৮
মূল্য : ৫৫০/-

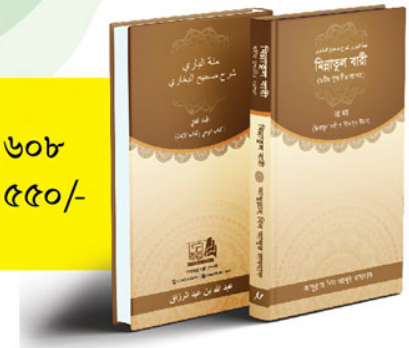

মিন্নাতুল বারী
২য় খণ্ড (কিতাবুল অহী ও কিতাবুল ঈমান)

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

পৃষ্ঠা : ১৬০
মূল্য : ১০০/-

সদাচরণ
(যে আমলে জান্নাত মেলে)

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজট করুন tubapublication.com

রাজশাহী
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০